ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

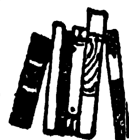
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

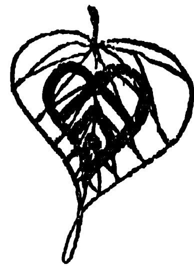
প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই পৌষ,
১৮৮২ শকাব্দ

২·৫০
ন: প:

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রক ঃ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস
৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬







ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ববীন্দ্রনাথেব জন্মেব মাত্র তিন মাস পূর্বে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায হুগলী জেলাব খন্যান গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পবিবাবে ১১ই ফেব্রুয়াবী ১৮৬১ তাবিখে জন্মগ্রহণ কবেন। যে সকল মহান ব্যক্তি তাঁহাদেব নিজস্ব ধ্যান-ধাবণাব মধ্য দিযা অধঃপতিত বাঙালী জাতিকে—তথা ভাবতবাসীকে আত্মস্থ হইতে এবং বাহুবলেব দ্বাবা পবাধীনতাব শৃঙ্খল মোচনে আহ্বান কবিযাছিলেন, ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাদেব মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ।

এই মহাত্মাব গৃহস্থ-নাম ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায। বাংলাব স্বদেশী আন্দোলনেব সমযে অন্যতম ঋত্বিক-রূপে তিনি আবির্ভূত হন। 'সন্ধ্যা' নামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাংলা দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন দ্বাবা স্বদেশেব স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান কবেন।

ববীন্দ্রনাথেব পূর্ণ উদয ও বিকাশেব পূর্বেই ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাব সম্পাদিত পত্র 'Sophia'-ব ১লা সেপ্টেম্বব ১৯০০ তাবিখেব সম্পাদকীয আলোচনায ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে "The World Poet of Bengal" নামে যে প্রশস্তি কবিযাছিলেন, তাহা ভবিষ্যতে সর্বতোভাবে সার্থক হইযাছিল। তিনি কিছুদিন ববীন্দ্রনাথেব সহকাবীরূপে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'ব শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন।

নানা ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতেব মধ্য দিযা ব্রহ্মবান্ধবেব জীবন অতিবাহিত হয়। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মধর্ম, মধ্যে বোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায-প্রচাবিত খৃস্ট-ধর্ম, শেষে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কবিযা পিতৃধর্মে আশ্রয গ্রহণ কবেন। বহু ব্যক্তি ও ভাবেব মধ্যে কালাতিপাত কবিলেও তাঁহাকে একমাত্র বাংলার প্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামেব যোদ্ধা হিসাবে গণনা কবা হয। 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত রচনার জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের আদালতে তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। আদালতে বিবৃতিদান কালে তিনি

বলেন—"I do not take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development." ব্রহ্মবান্ধবের এই উক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিচার শেষ হইবার পূর্বেই ২৭শে অক্টোবর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব পরলোক গমন করেন।

ব্রহ্মবান্ধবের রচনা প্রধানতঃ সাময়িক সাহিত্য অবলম্বন করিয়া সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত হয়। এগুলি বর্তমানে অত্যন্ত দুর্লভ। তাঁহার জীবিত কালে প্রকাশিত একমাত্র পুস্তক 'বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' শ্রাবণ, ১৩১৩ সালে প্রকাশিত হয়। কতকগুলি রচনা বিভিন্ন সাময়িক-পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন সময়ে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়, তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে।

বর্ত্তমান ১৯৬১ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইল। এই অবকাশে প্রধানতঃ ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য বর্ত্তমান সংগ্রহে তিনটি রচনা গ্রথিত হইল। এই কারণে এই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে—"ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা।"

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত এই গ্রন্থ প্রকাশে এবং ফাদার পি. ফালো এস. জে., ব্রহ্মবান্ধবের চিত্র ও একটি পত্র ব্যবহার করিতে দিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট আমরা সেজন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রকাশক

বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি

বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি

আমি একজন ইংরেজি-পড়া সন্ন্যাসী। আজকাল অনেকানেক সন্ন্যাসী বিলাতে গিয়ে শাস্ত্রের বুকনি-মিশানো-বক্তৃতা কোরে খুব হাততালি খায়। আমারও একদিন শখ হোলো যে বিলাতের হাততালি খাবো। কলিকাতা বুম্বই ও মান্দ্রাজের হাততালি খুব খেয়েছি—এখন দেখি একবার চম্পকবরণ হাতের হাততালি কেমন মিষ্টি। সন্ন্যাসীর মন—যেমনি খেয়াল অমনি উঠা।

পাঠক—তোমরা বিলাতগামী সন্ন্যাসীর রূপ বোধহয় কখনও দেখ নাই। সাধারণতঃ মাথা গোঁফ দাড়ি সব মুড়ানো—রেশমের পাগড়ি রেশমের আলখাল্লা—পায়ে বিলাতী বুট—হাতে ছড়ি মুখে চুরুট—সঙ্গে পোর্টম্যাণ্ট গ্ল্যাডস্টন-ব্যাগ স্ট্র্যাপ-বাঁধা বিলাতী-কম্বল-জড়ানো বিছানা—গলায় টাকা-মোহর-ভরা কুরিয়ার ব্যাগ। আহা মরি—সেজেছে ভাল। আমিও ঐ রকম কতকটা ঢং ধরিলাম—কেবল পয়সার অভাবে রেশমটা জুটিল না। আর বুট চুরুট ছড়ি পোর্টম্যাণ্ট ইত্যাদি আমার সৎসঙ্গ অনেকদিন ত্যাগ কোরেছে। হায়রে—আমার কেবল ইংরেজি পড়াই সার। আমার ছিল—গায়ে একখানি বনাত ও হাতে একখানি কম্বল। বন্ধুবান্ধবেরা ধোরে কোরে একটা গোব্দড় মোটা গরম কাপড়ের আলখাল্লা কোরে দিয়েছিল। দিয়েছিল তাই বেঁচেছি—নহিলে বিলাতের ঠাণ্ডায় দফা রফা হোয়ে যেতো।

বুম্বইয়ে জাহাজে উঠিবার আগে ডাক্তারে পরীক্ষা করে—পেলেগ হয়েছে কি না—আর সব বোঁচকা-বুঁচকি কলের ভিতর পুরে একরকম ঔষধ দিয়ে ধুয়ে দেয়। আমার জিনিস-পত্তর দেখিতে এলো—দেখে কিছুই নাই। একেবারেই অবাক্। একটা ব্যাগ বা পুঁটুলিও নাই। শুধু হাতে বিলেত। ডাক্তার সাহেব একটু এদিক-ওদিক চেয়ে একখানা পাস দিয়ে দিলে। আমি একেবারে নবাবের মত গিয়ে জাহাজে

উঠিলাম। আর আমার সহযাত্রীদের দুর্দশার সীমা রহিল না। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি পুলিশের গুঁতো খুব চলিতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম— কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। এ দুর্দশা কেবল দেশী যাত্রীদের —সাদাচামড়া দেবদেবীর নহে।

জাহাজে উঠে ভাবিতেছিলাম ভোজনের ব্যবস্থা কি কোরে করিব। মাছ মাংস রুচে না—আর সাহেবেরা তরকারি চর্বি দিয়া রাঁধে। ঘৃত আমাদের নিকট অমৃত— তাহা কিন্তু কর্তারা মুখে করিতে পারেন না— যেমন কপাল। জাহাজ ছাড়িবার সময় বড় গোলমাল। ছাড়িয়া দিলে দেখি যে কতকগুলি সিন্ধুদেশবাসী হিন্দু সওদাগর জাহাজে উঠিয়াছে। কেহ মল্‌টা (Malta) কেহ জিব্রল্টার (Gibraltar) কেহ তুনিস (Tunis) যাইতেছে। সিন্ধীরা সর্বত্র ব্যবসায় করিতে যায়। জাপান, মার্কিন, ইউরোপ, আফ্রিকা সকল স্থানেই ইহাদের দোকান আছে। ইহারা জাতিতে বণিক্ কিন্তু মাংস ও মদিরা খায়। সমুদ্রপারে যাইলে ইহারা জাতিচ্যুত হয় না। আমি সিন্ধুদেশে অনেক দিন ছিলাম, তাই ইহাদের মধ্যে দুই একজন আমাকে জানিত। খুব খাতির। সকাল বেলা চা ও হাতগড়া-রুটি— মধ্যাহ্নে ভাত ডাল তরকারি—অপরাহ্নে চা ও রাত্রিতে রুটি তরকারি। ইহাদের সঙ্গে রাঁধুনি ও চাকর ছিল। সে খালাসিদের চুল্লীতে পাক করিয়া আনিত। বেশ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটিত। সমস্ত দিন তাস পাশা ও সঙ্গীত চলিত। তাহাদের মদিরাপানও সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সিন্ধীরা সুরাপান করে অল্পস্বল্প। মাতাল বড় একটা হয় না। জাহাজে একদিন একজন সিন্ধী উপরোধের দায়ে একটু বেশী খেয়ে মাতাল হোয়ে পোড়েছিল। সকলে তাহাকে এত ধিক্কার দিলে যে সে বেচারী লজ্জায় মরে।

জাহাজে তিন জন বুয়র ছিল। তাহারা বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। মুক্ত হইয়া দেশে যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে একজন সেনাপতি (Commandant)। ইনি বেশ ইংরেজি

জানেন। বুয়র যুদ্ধের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস ইংরেজিতে লিখিয়াছেন। সর্বসমেত পঁচিশ-ত্রিশখানা মোটা মোটা খাতা। শীঘ্রই ইহা মুদ্রিত হবে। আমি ইহার অনেকটা পড়িয়াছি। যে জাহাজে ইনি বন্দী হইয়া ভারতে আনীত হন - তাহাতে ৫০০ পাঁচশত বুয়র ছিল। ইনি বলেন যে সেই পাঁচশতের মধ্যে কেবল ৬৪ জন যোদ্ধা আর বাকি লোক কখনও যুদ্ধ করে নাই। এলোপাতাড়ি কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাহাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। ইনি ডিওয়েটের বন্ধু। ডিওয়েট একজন কৃষক (Farmer)। লেখাপড়া পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। যুদ্ধের আগে কে জানিত যে একজন গৃহস্থ কৃষক জগন্মান্য বীর হইয়া উঠিবে। ডিওয়েটের প্রস্থান বিবরণ শুনিয়া ইনি হাসিয়া উঠিলেন। গরু-মহিষদের সঙ্গে সঙ্গে ডিওয়েটের পলায়ন—ইহা কেবল কাল্পনিক। ডিওয়েট ইংরেজদের ঘেরাওকে কিছুই গ্রাহ্য করিত না। কোলেনসো (Colenso) এবং মডার নদীর (Modder river) যুদ্ধে বুয়রেরা ইংরেজদিগকে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে চড়াও কোরে ফতে করা একেবারে অসাধ্য। তাই কীচনর জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন কখন শিকার আসিয়া পড়ে। বোথা ইংরেজের Blockhouse অর্থাৎ জালের গাঁটের মতন ছোট ছোট কেল্লা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু রসদের অভাবে বুয়রেরা বড় ঘাল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজ সেনাদের রসদ লুট করিয়া তাহাদিগকে চালাইতে হইত। ইহাতেও তাহারা পেছপাও হয় নাই। কিন্তু যখন হাজার হাজার বুয়র-রমণী ও বালক ইংরেজের কারাগৃহে মরিতে লাগিল তখন তাহারা মায়াবশে ও নির্বংশ হইবার ভয়ে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিল। এই ত আমার সহযাত্রী বুয়র সেনাপতির ইতিহাসের দুই একটি কথা। আমার একটি ছোট তামার লোটা ছিল। সেইটির উপর এঁর খুব নজর পোড়েছিল। তাই আমি ঐ লোটাটি তাঁহাকে উপহাররূপে দিয়া ফেলিলাম। ভারি খুশি। কিন্তু লোটা বিনা আমার বড় দুর্দশা হইতে লাগিল।

বুম্বই হইতে অদন (Aden) পর্যন্ত সমুদ্র কিছু বিক্ষুব্ধ ছিল। তাই আমি বড় পীড়িত (Sea-sick) হোয়েছিলাম। মনে হইতেছিল কি কুক্ষণে জাহাজে উঠিয়াছিলাম। অনেকেরই আমার মতন অবস্থা হোয়েছিল। কিন্তু অদনে আসিয়া সব সারিয়া গেল। অদন—লোহিত সাগরের ফটক। লোহিত সাগর অতি সুন্দর। তুই দিকে তুই ভূখণ্ডের উপকূল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। মধ্যে নীল পয়োধি। জল ও স্থল তুইই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া চোখের ক্লান্তি হয় না। যেতে যেতে আফ্রিকার উপকূলে একটা পাহাড় দেখা গেল তাহার নাম জবল শয়তান অর্থাৎ শয়তানের পাহাড়। তুই একজন আরবদেশীয় সওদাগর বলিল যে, এখানে জিনেরা অর্থাৎ ভূতেরা রাত্রিতে বড় ধাঁ-ধাঁ লাগিয়ে দেয়। দেখা যায় যে, দিব্য দীপালোকশোভিত জাহাজ বেগে ধাবিত হইতেছে। একেবারে যেন সত্যিকারের জাহাজের ঘাড়ে এসে পড়ো পড়ো হয়—নিশান (Signal) মানে না। যখন সকলে নিরাশ হয়—ঠোকর লেগে ডুবে যাবার ভয়ে আকুল হয়—তখন কোথায় বা জাহাজ আর কোথায় বা আলোকমালা—সব একেবারে অদৃশ্য। আরব-সওদাগরের কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু নাবিকেরাও ঐ কথা বলিল। আশ্চর্যের বিষয় যে একজন লেখাপড়া জানা জাহাজি ইঞ্জিনিয়রও সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এর পরে আর কি বলিব।

অদনে খুব গরমি। কিন্তু যতই জাহাজ উত্তরে উঠিতে লাগিল ততই ঠাণ্ডা পড়িতে লাগিল। আমার শরীর তখন বেশ ভাল ছিল। আমি অনেক রাত্রি অবধি জাহাজের উপরিস্থ ছাদে (Upper deck) বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের বাহার দেখিতাম। চাঁদ উঠিলে বড়ই শোভা হয়। রাত্রিতে একরকম মাছ দেখা যায়—সেই মাছের মুখ হইতে আলো (Phosphorus) বাহির হয়। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজের সঙ্গে ছোটে। দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্র থেকে তুবড়ি বাজি উঠিতেছে। আমি ইহাদের নাম রাখিয়াছি পরী মাছ। উড়ন্ত মাছও দেখিলাম।

তবে আর ওসব লিখিব না। সমুদ্র-যাত্রার বর্ণন চর্বিত-চর্বণ হোয়ে গেছে। থোড়-বড়ি-খাড়াকে খাড়া-বড়ি-থোড় বলিয়া আর কি হবে।

অল্পে অল্পে জাহাজ সুয়েজের (Suez) খালে প্রবেশ করিল। খালটি আমাদের কলিকাতার খালের অপেক্ষা কিছু চওড়া। দুই ধারে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। মাঝে মাঝে বৃক্ষলতা-শোভিত ইষ্টিশান। খালটি প্রায় ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। এই মরুভূমির মধ্য দিয়া অত লম্বা খাল কাটা অতিমানুষিক ব্যাপার। খালের প্রারম্ভে সুয়েজ বন্দর আর শেষে সৈয়দ বন্দর।

সৈয়দ বন্দর ছাড়াইয়া ভূমধ্যসাগরে আসিয়া পড়িলাম। আমার আবার রাত্রিতে বাহিরে বোসে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কোমরে খুব ব্যথা ধরেছিল। কতকটা উত্থান-শক্তি-রহিত হোতে হোয়েছিল। মেরে কেটে এক-একবার জাহাজের উপর আসিতাম। সৈয়দ বন্দর থেকে তিন দিন কেবল জলরাশি। তার পরে সিসিলি দ্বীপ দেখা গেল। সিসিলির এট্‌না আগ্নেয় পর্বত দেখিতে অতি ভীষণ। অম্বর-চুম্বিত শিখর-দেশ হইতে অবিরত দীপ্ত ধূমরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছে। ধূসরকৃষ্ণ জলদজাল কটিদেশকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের জাহাজখানি এক ইতালীয় কোম্পানীর। ইহার গম্য-স্থান জেনোয়া (Genoa) শহর। ৫ই অক্টোবর বুম্বই ছাড়িয়াছিল। ১লা নভেম্বর নেপল্‌স্ শহরে আসিয়া পঁহুছিল। ইতালীয়েরা এই শহরকে নাপলী (Napoli) বলে। ইংরেজ বাহাদুর এই সুন্দর নামটিকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। নাপলী একটি ছবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দূর থেকে ঠিক যেন চিত্রার্পিতারম্ভ বলিয়া বোধ হয়। আমার টিকিট জেনোয়া অবধি ছিল। তথায় শুনিলাম নাপলী হইতে রোম (ইহার ইতালীয় নাম রোমা) রেলে চারি ঘণ্টার রাস্তা। রোমা দেখিবার বড় শখ হইল। জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িলাম। ভয়ানক কোমরে ব্যথা নিয়ে অতি কষ্টে ইষ্টিশানে গেলাম। কিছুক্ষণ

দুই

প্রথম চিঠিতে রোমে আসা পর্যন্ত লিখেছি। এক হোটেলে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা ট্রামগাড়ি কোরে শহর দেখিতে বাহির হোলাম। খুব ঠাণ্ডা পোড়েছে আর পোড়া কোমরের ব্যথাও খুব চেগে উঠেছে। তবুও মোরে মোবে চলিলাম। শহরের কথা আর কি বলিব। দোকানগুলি এমনি সাজানো যেন এক একখানি ছবি। এত ফুলের দোকান যে দেখে বিস্মিত হোতে হয়। সৌন্দর্যকে প্রকৃতির আড়াল থেকে টেনে বাহির কোরে মাঝ মজলিসে বসাতে এরা বড়ই মজবুত। রোমনগর সাতটি পাহাড়ের উপর নির্মিত। তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। কোথাও উঁচুতে উঠিতে হয়, কোথাও বা নীচে নামিতে হয়। রাস্তাগুলি মাঝে মাঝে বড় বড় চকে (Square) এসে পোড়েছে। চক সকল বড় সুন্দর। চারিদিকে ভাল ভাল বাড়ি ও দোকান। মাঝখানে পাথরের মূর্তি ও ফোয়ারা। ফোয়ারা দিয়ে অনর্গল স্বচ্ছ শীতল জলধারা পড়িতেছে। রোমে চারিটি বৃহৎ পয়োনালী (aqueduct) আছে। এই নালী সকল দুই সহস্র বৎসর পূর্বে নির্মিত। দূরে এক উচ্চ পাহাড়ের ঝরনা হোতে ইহাদের ভিতর দিয়া শহরে জল আসে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও অনুপম প্রস্তরমূর্তি সকলে রোমের পুরাতন কীর্তি জীবন্তভাবে পরিরক্ষিত রহিয়াছে। এইরূপে শহর দেখিতে দেখিতে উধাও মনে চলেছি এমন সময়ে ট্রামের অধিনায়ক (conductor) এসে বলিল যে, ট্রাম আর যাইবে না। নামিয়া দেখি যে এক প্রকাণ্ড দেবালয় বা গির্জার সম্মুখে এসে পড়েছি। দলে দলে নরনারী বালক-বৃদ্ধ ধনী-দরিদ্র—কেহ বা বাহির হোয়ে আসছে, কেহ বা ভিতরে যাচ্ছে। এই দেবালয় এত বড় যে, ইহার মধ্যে ও প্রাঙ্গণে ষাট হাজার লোক ধরে। দেখিলে মনে হয় যে, ইহা বিশ্বকর্মা নিজহাতে নির্মাণ করেছেন। ভিতরে যাহা দেখিলাম তাহা আমার সাধ্য নয় বর্ণন করা।

ওঁ

(৭ 3 Jan. 1906

নন্দ — তোমার কার্ড পাইয়াছি। তুমি নির-
পদে পঁহুছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম।
যখন [illegible] তখন ভাল
কাপড়চোপড় দেখিয়া এস। কুরুক্ষেত্র-
দীঘি প্রভৃতি ~~[illegible]~~ ক্ষেত্র — ভালরূপ-
[illegible] দেখিও। [illegible]
থাকিব না। শুনিয়াছ ত [illegible] —
মাটি — মাটি নয় — কিন্তু মা-টি।
আর [illegible] লোকদের পায়ে [illegible]
চেষ্টা করিও।

আমরা কলিকাতার লোক
বন্দে মাতরম্ বলি কিন্তু মা কাহাকে
বলে কি বস্তু তাহা জানি না। আমরা
দেশকে ভাল না বাসি — কেবল ইংরাজ
বিদ্বেষ দিয়া আমাদের কোন শ্রদ্ধা নাই
— তাহাদের অনুকরণও হয় না — আর
[illegible] না হইলে কিছুই হবে না।

আমরা এখানে ভাল আছি।
[illegible] ভগ্নী ও তুমি আমার
আশীর্বাদ জানিও। ১৯ তারিখ ১৭ই পৌষ
১৩১২।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের হস্তলিপি

বর্ণনা করিতে যাওয়া কেবল চক্ষু কর্ণে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া। মণি-মুক্তা প্রবালাদি নাই কিন্তু দেবালয়টি রজতশুভ্র মর্মরের হাস্যকৌমুদীতে যেন বিধৌত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কত শত সাধু সাধ্বী মহাজনের (Christian Saints) মূর্তি ও চিত্র স্থানটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। ইতালী দেশে পাঁচ সাতশত বর্ষ আগে মহা মহা শিল্পী ও চিত্রকর জন্মিয়াছিলেন। এখনও ইতালীর শিল্প ও চিত্রণবিদ্যা জগতে অতুলনীয়। এই চিত্রকরেরা দেবালয়ের দেওয়ালে ভিতরে বাহিরে ছবি আঁকিতেন। জগতে যত চিত্র আছে তন্মধ্যে রাফেয়েল নামক এক দৈবশক্তি-সম্পন্ন চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত মাতৃমূর্তি না কি সৌন্দর্যে ও ভাবুকতায় শ্রেষ্ঠ। কাস্থলিক (Catholic) খৃস্টানেরা মাতৃমূর্তির বড় ভক্ত। মাতা মেরী (Mary) বালক যীশুকে কোলে করিয়া দণ্ডায়মানা। ইহাকেই মাতৃমূর্তি (Madonna) বলে।

চিত্রকর মায়ের মুখে এক অপূর্ব করুণরস ঢালিয়া দিয়াছেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে বলে যে, মা আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র অকালে নিহত হইবেন। তাই সুতস্পর্শজনিত আনন্দ বিচ্ছেদ-বিষাদে সংমিশ্রিত। মিলনানন্দের ভাগীরথী যেন ভাবী বিরহশোকের কালিন্দীর সহিত মিলিয়া মায়ের চোখের আর্দ্রকরুণভাব গড়িয়াছে। এমন মঙ্গলময়ী মূর্তি অতি বিরল। আজকাল য়ুরোপের ছবি আঁকিবার ঢং বদলিয়া গেছে। মঙ্গলভাবের লেশমাত্র নাই, কেবল রূপের ছটা ঘটা। উপাস্য মূর্তি সকলেরও এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। অধিক সৌন্দর্যবিন্যাসে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। তজ্জন্য প্রতিমার সৌন্দর্য একটু মঙ্গলভাবের দ্বারা চাপিয়া রাখিতে হয়। আমাদের দেশে এই ভক্তি-তত্ত্ব বেশ জানা আছে। এখনও য়ুরোপে অনেক দেবালয়ে প্রতিমা সকল একেবারেই সুশ্রী নয়। আর ভক্ত বিশ্বাসী কাস্থলিক খৃস্টানেরা প্রাণ গেলেও সেই সকল কুরূপ প্রতিমাগুলির পরিবর্তে সুরূপ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। যাহা হউক, রোমের এই সুবৃহৎ দেবালয়ে অদৃশ্য স্বর্গীয় ভাব সকল—ন্যায় দয়া শক্তি ক্ষমা আনন্দ প্রেম ধ্যান

জ্ঞান ভক্তি সেবা—প্রস্তর-মূর্তিতে ও চিত্রপটে যেন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি যেদিন এই দেবালয়ে গিয়াছিলাম সেদিন কাস্থলিকদের শ্রাদ্ধপর্ব। কাস্থলিকেরা মৃত স্বজনের আত্মার কল্যাণের জন্য যজন মন্ত্রপাঠ ও দান করে। পুরোহিতেরা যজমানের হইয়া যজন ও মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। সেদিন তাই বিবিধবর্ণশোভিত যজনযোগ্য বসন পরিধান করিয়া তাঁহারা লাতিন (Latin) ভাষায় গম্ভীর স্বরে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন, আব ধূপধুনায় বেদী গৃহ সকল আমোদিত। কাস্থলিকদের আচার-পদ্ধতি অনেকটা হিন্দুদের সঙ্গে মিলে।

দেবালয়ের লাগাও পোপেব (Pope) প্রাসাদ। পোপ কাস্থলিক খৃস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু। ইংরেজি ভাষায় ইঁহাকে পোপ বলে কিন্তু ইতালীয় ভাষায় পাপা অর্থাৎ পিতা বা বাবা বলে। ধর্ম বিষয়ে পোপের বিধি বা শাসনকে সমগ্র কাস্থলিকমণ্ডলী (সংখ্যা বিশ কোটি হবে) একান্ত মান্য বলিয়া স্বীকার কবে। পোপের সঙ্গে আর ইতালীর রাজার সঙ্গে এখন ঘোর বিবাদ। রোম ও তৎপার্শ্বস্থ কতকটা প্রদেশ পুরাকালের নৃপতিরা দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। বর্তমান রাজার পিতামহ এই দেবোত্তর সম্পত্তি—যাহা পোপেদের সম্পূর্ণ অধীনে ছিল—কাড়িয়া লন। পোপের কেবল প্রাসাদ ও দেবালয়টি আছে। রোম এখন রাজার। পোপ এইজন্য ইতালীর রাজাকে ধর্মমণ্ডলী-চ্যুত করিয়াছেন। নৃপতির প্রাসাদটি আগে পোপেদের ছিল। এই প্রাসাদ এখন অভিশপ্ত ও পতিত। ইহাতে কোন পুরোহিত যজনক্রিয়া করেন না। রাজমহিষী বা রাজপুত্রেরা মণ্ডলীচ্যুত নহেন। তাঁহাদের ও রাজকুটুম্বদের জন্য প্রাসাদের গায়েই এক গৃহ নির্মিত হইয়াছে। সেখানে পুরোহিতেরা যজনক্রিয়াদি করেন। ইতালীর লোকেরা যেমন রাজভক্ত তেমনি পোপভক্ত। তাহারা মহা ফাঁফরে পড়িয়াছে। এই বিবাদ যে শীঘ্র মিটিবে এরূপ আশা নাই। পোপ আপনাকে দেবোত্তর রোমের রাজা মনে করেন এবং রাজাকে অপহর্তা

বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন কাস্থলিক নৃপতি রোমে আসিলে অগ্রে তাঁহাকে পোপের সহিত দেখা করিয়া পরে রাজার সহিত দেখা করিতে হয়—নইলে পোপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না। রুশের সম্রাট শীঘ্রই রোমে আসিবেন। তিনি রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি কাস্থলিক নহেন। কিন্তু যেদিন তিনি পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন সেদিন তাঁহাকে রোমে যে রুশ এল্‌চির (Ambassador) বাটী আছে সেই বাটী হইতে রওয়ানা না হইলে পোপ তাঁহার সহিত দেখা করিবেন না।

রোমের দেবালয় দেখার পর আমার কোমরের ব্যথা অত্যন্ত বেড়ে উঠিল। একেবারে চলচ্ছক্তিহীন। তাই ট্রামে কোরে আস্তে আস্তে ইষ্টিশানে গিয়ে বোসে রইলাম। আমার রোম দেখা হোয়ে গেল। দেশে ফিরে যাবার সময় ভাল কোরে পারী (Paris) ও রোম নগর দেখিয়া যাবো মনে করেছিলাম।

আমি যখন ইষ্টিশানে গেলাম তখন বেলা প্রায় চারিটা। গাড়ি রাত্রি নয়টার সময়। চুপ করে বোসে আছি—ভাবছি কি করি এমন সময় এক বহুভাষাবিৎ কর্মচারী (Interpreter) এল। ইহার কাজ বিদেশীদের সাহায্য করা। বেচারি আমাকে খুব খাতিরযত্ন করলে, টিকিট কিনে দিলে ও গাড়িতে চড়িয়ে দিলে। একেবারে লণ্ডনের টিকিট লইলাম। টিকিটটা একখানা আট-দশ-পাতা ছোট-খাতার মতন—পাতে পাতে ছাপ মারা অর্থাৎ যতগুলি টিকিট যাচাই করিবার (Checking) ইষ্টিশান আছে তাহাতে ততগুলি পাতা। প্রত্যেক জায়গায় এক একখানা কোরে পাতা ছিঁড়ে নেয়। ইতালী ভাষায় লণ্ডনকে লণ্ড্রা (Londra) বলে। কেন যে আমরা দেশ ও নগরগুলিকে ইংরেজের মতন বিকৃত কোরে বলি তা ত বুঝিতে পারি না। কালকোটাকে ইংরেজ কালকাটা (Calcutta) বলে আর আমরা একটু শুদ্ধ কোরে বলি কলিকাতা। কলিকাতা কথাটা না সাপ না বেঙ। ইংরেজের অনুকরণ করিলে ফিরিঙ্গি ছাড়া

আর কিছু হওয়া যায় না। আর ও ভেবে কি হবে। গাড়ি আপন মনে লণ্ড্রার দিকে ছুটিল। পরদিন সকাল বেলা নয়টার সময় তুরীন (Turin) নগরে আসিল। খুব শীত রোমে। প্রত্যেক গাড়ির নীচে আগুন রেখে দিয়েছিল। একটা কোরে কাঁটা বা হাতল আছে—সেটা বামদিকে সরালে গাড়ি খুব গরম হয়—মাঝামাঝি রাখলে মাঝামাঝি হয় আর ডানদিকে সরালে খুব ঠাণ্ডা হয়। তুরীন ইষ্টিশানে দেখি আর এক বন্দোবস্ত। প্রত্যেক গাড়িতে দুটো কোরে মোটা মোটা চৌকোণা লোহার থামের মতন কি রেখে গেল। তার উপর বেশ পা রাখা যায়। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গাড়ি যখন আরও উত্তরে উঠিতে লাগিল তখন পা দুটো ঠাণ্ডায় কালিয়ে যেতে লাগিল। কি জানি বাপু লোহার থামগুলো কি জন্যে দিয়ে গেছে। আমি তার উপর পা একেবারে দিই নি। হঠাৎ কিন্তু একবার তার উপর পা পোড়ে গেছে আর দেখি যে বেশ গরম। পা দুটো গরম কোরে বাঁচিলাম। তখন দেখি থামগুলি গরম জল পোরা—যাত্রীদের পা গরম রাখিবার জন্য। আমার গাড়িতে কেহ ছিল না যে বুঝিয়ে দেবে। গাড়ি আল্‌পস্ (Alps) পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়িল। ভয়ানক ভয়ানক গিরি-সঙ্কট ও পর্বতের পেটের (Tunnel) ভিতর দিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এক-একটা পেট পার হইতে কম-বেশি ১০।১৫ মিনিট কোরে লাগে। এখানকার কী মনোহর দৃশ্য! দুই দিকে উচ্চ পর্বতমালা। তাহাদের শিরোদেশ স্থানে স্থানে তুষারমণ্ডিত। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ছোট ছোট গ্রাম আর সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় হরিৎ-শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে কল্লোলিনী নির্ঝরিণী সকল মেঘমণ্ডলের ছায়াপথের ন্যায়—দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের ন্যায়—পর্বত-বক্ষ শোভিত করিয়া রেখাকারে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামগুলি যেন এক-একটি আশ্রম। প্রত্যেক গ্রামে একটি কোরে দেবালয় বা গির্জা আছে। এখানে সভ্যতার প্রকোপ কিছু কম তাই ধর্ম বুঝি শহর থেকে পালিয়ে এসে এই

পার্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেমেয়েগুলি বেশ নাদুস-নুদুস। গালগুলি পাকা করমচার মত লাল।

পর্বতের অত্যুচ্চ বরফান প্রদেশে কাস্থলিক সন্ন্যাসীদের (Monk) মঠ আছে। ইঁহাদের কাজ ধ্যানধারণা করা—গ্রন্থ লেখা আর অতিথিসেবা করা। এই মঠ সকলে বড় বড় কুকুর আছে (St. Bernard's dog)। তাহারা আহার-পানীয় লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পথভ্রান্ত ক্ষুধার্ত পথিকদিগকে আহার দেয় ও পথ দেখায়। আর যদি শীতে বিকলাঙ্গ হয় তাহা হইলে পৃষ্ঠে করিয়া মঠে লইয়া আসে। এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে (France) পরাঙ্ক দেশে আসিয়া পড়িলাম। প্রকৃতি এই দেশটিকে বড় ভালবাসে। শুনেছি য়ুরোপে এমন স্নুন্দর দেশ আর নাই। সেই রকমই বোধ হোলো। ইতালীও মনোরম কিন্তু একাধারে এত সৌন্দর্য নাই। যেমন বড় বড় পাহাড় তেমনি নদী ও সমতল ভূমি। যাহা হউক, গাড়ি ত এক নিশ্বাসে রাত্রি ১১ এগারটার সময় পারী নগরীতে এলো। নাপলীতে ১লা নবেম্বরে জাহাজ থেকে নামি। সেই দিন রাত্রিতে রোমে আসি। পরদিন ২রা রবিবার রাত্রিতে রোম ছাড়ি। তার পরদিন রাত্রিতে পারী। পারী নগরী আর দেখিলাম না। পরদিন বেলা নয়টার সময় গাড়ি। তাই কাজে কাজে শীতে হি হি করিতে করিতে একটা হোটেলে গেলাম। শুধু শোবার জন্য প্রায় দুই টাকা লইল। শোবার আরামের কথা আর কি বলিব। কম্বলে শোয়া অভ্যাস কিন্তু আয়েস-বোধটা বেশ আছে বুঝা গেল। আমার প্রকোষ্ঠে একটা স্প্রিং খাট—শুলেই একহাত নেবে যেতে হয়। তার উপরে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা। দেওয়ালে একটা বোতাম টিপিলেই ঘরময় বিজলীর (electric) আলো। আর বড় বড় আরশি টেবিল, কাপড় রাখিবার দেরাজ আর ঘড়ি আর একটা হারমোনিয়ম। আরাম করে শুয়ে নেওয়া গেল। কম্বলে শুয়ে শুয়ে হাড়-মটমটানি রোগ ধরেছিল। হাড় জুড়িয়ে গেল। তবে বৈরাগ্যটা না জুড়লেই বাঁচি। পারী নগরী

হইতে রেলে নয়টার সময় গাড়ি ছাড়িল। সমুদ্রের বন্দরে বেলা ১২টায় পৌঁছিল। তার পরে জাহাজ। আবার তার পরে গাড়ি। অবশেষে উপনীত লণ্ডনে। তখন সন্ধ্যা। সেখানে সেই রাত কাটিয়ে তার পরদিন ৫ই উক্ষপারে (Oxford) আসিলাম। এখানে সেই অবধি আছি। এখানে প্রায় ১৮।২০টা কালেজ আছে। দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্রেরা পড়িতে আসে। শহরের দুই ধারে নদী। ইহার বর্ণনা পরে লিখিব।

এখন আমার হাততালি খাবার কথা। এক চোট হোয়ে গেছে। গত মঙ্গলবারে আমি—হিন্দু চিন্তা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা (Hindu Thought and Western Culture)—বিষয়ে বক্তৃতা করি। এখানকার সংস্কৃত অধ্যাপক (Boden Professor of Sanskrit) এ. এ. মগ্‌দানল এম-এ. সভাপতি ছিলেন। লোকজন মন্দ হয় নাই। কলিকাতার জর্জ ট্রিভিলিয়ান (Trevelyan) উপস্থিত ছিলেন। আমার বক্তৃতার মর্ম এই যে, জীবনপথের জটিল সমস্যা ভঞ্জন করিতে য়ুরোপীয়েরা কেন হিন্দু চিন্তাপ্রণালীর সাহায্য না লয়। যুদ্ধের সময় ভারতের সৈনিক চাই। কিন্তু প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির যুদ্ধের সময় ভারতের দর্শন কেন না চাই। হিন্দু জাতি কেমন করিয়া সমস্যা ভঞ্জন করে তাহার দুই একটি নমুনা দেখাইলাম আর বলিলাম—শুধু সুখ্যাতি করিলে হইবে না—হাতে-কলমে কোরে দেখিতে হবে—তা হোলে সুফল ফলিবে। খুব হাতহালি। লোকে আরও বক্তৃতা শুনিতে চায়। আমিও তাই চাই।

নামটা একটু রোটে গেছে। ছোকরা মহলে কথা চলেছে। অধ্যাপকেরাও কানাকানি করিতেছেন। যাঁরা সিভিলিয়ানদের পড়ান তাঁরা আমার খুব বন্ধু হোয়েছেন। এবং দুচারজন যারা সিভিলিয়ানি পাস কোরেছে ও শীঘ্র ভারতে যাবে তারাও বক্তৃতা শুনে খুশি হোয়েছে। এখানে কালেজ ১৩ই ডিসেম্বরে বন্ধ হবে। তার মধ্যে আমি তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা করিব। প্রথম—হিন্দুর আস্তিক্যতত্ত্ব (Hindu

Theism)—দ্বিতীয় হিন্দুর নৈতিকতত্ত্ব (Hindu Ethics)—তৃতীয় হিন্দুর সমাজতত্ত্ব (Hindu Sociology)। আমার ভাগ্য ভাল। বেলিয়ল (Balliol) কালেজের প্রধান অধ্যাপক (Principal—এখানে Master বলে) ডাঃ কেয়ার্ড (Dr. Caird) আগামী বারে সভাপতি হইবেন। ইনি বর্তমানে ইংলণ্ডের একজন প্রধান দার্শনিক। সকলেই বলিতেছে এটা বড় সম্মানের বিষয়। বাস্তবিক আমি এখানে অজানিত অপরিচিত—কোন সুপারিশ চিঠিপত্রও আনি নাই। তবে ভাগ্যক্রমে আমার মাসিক পত্রিকায় (Twentieth Century) বেদান্তের আলোচনা মগ্‌দানল সাহেব পড়িয়াছিলেন—তাই বাঁচোয়া। তাই ত তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। আবার তার পরে ডাঃ কেয়ার্ড সভাপতি। আঙুল ফুলে কলাগাছ। এখন শেষ থাকিলে হয়। আগে থেকে ঢাক বাজিয়ে শেষে অপ্রস্তুত হওয়া বড় লজ্জার বিষয়। দেখি কিরকম হাততালি জমে। তারপর ডঙ্কা মেরে দেশে ফিরে যাবো। নহিলে চুপি চুপি পুনর্মূষিকো ভব।

ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা কিছু কিছু দেখেছি। এখন যাত্রা-বৃত্তান্ত সাঙ্গ হোয়েছে। এইবার একটু একটু সার কথা লিখিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

উক্ষপার

তারিখ ২০শে নভেম্বর

বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি

বিলাত-যাত্রীর তুখানি চিঠি লিখেছি। এখন আমি বিলাতবাসী—তাই প্রবাসীর ছাঁদে লিখিতে বসেছি।

বিলাত কথাটার মানে কেহ কেহ বোধ হয় জানেন না। বিলায়েৎ শব্দে পারসীতে স্বদেশ বা বাড়ি বুঝায়। যাহা ইংরেজের বিলায়েৎ বা দেশ তাহাকে আমরা বিলাত বা বিলেত বলি। আমি অনেক দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি—বিদেশ বোলে কোন কষ্ট কখনও অনুভব করি নাই। কিন্তু এবার সন্ন্যাসীগিরি ঘুরিয়ে দিয়েছে। কেবল আলু-সেদ্দো আর কপি-সেদ্দো খেয়ে খেয়ে বিঘ্নি হয়ে গেছে। মনে হয়, দেশে ছুটে যাই আর একটা ঝালঝাল তরকারি ও তেঁতুল-চেরার টক খেয়ে জিভটাকে শানিয়ে নি। একটু সুরা আর মাংস গ্রহণ করিতে এখানকার বন্ধুরা আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু আমি রাজি নহি। আর যা করি না করি—আমিষ, মদিরা ও ইংরেজি পোশাক একান্ত পরিবর্জনীয়। আমার স্বর্গীয়া পিতামহী বলিতেন—ছেলেগুলো নেক্‌চর দিয়ে দিয়ে উচ্ছন্ন গেল। আমি ত উক্ষপারে এসে তিন তিনটে বক্তৃতা দিয়েছি। উচ্ছন্ন ত গেছি আর এই বক্তৃতার চোটে বঙ্গবাসীতে চিঠি লেখাও হয় নাই—পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।

এখানে প্রথম দিন রাস্তায় বেরিয়ে মহা বিপদ। ছেলেরা দেখ দেখ (look look)—বোলে আমার পানে ছুটে আসে—পুরুষেরা মুচকে হাসে—আর মেমসাহেবেরা একটু শিউরে উঠে বা অল্প দন্তরুচি-কৌমুদী বিস্তার করে। কেননা আমার রঙ ময়লা অর্থাৎ আমি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। লোকের ভিড় ঠেলে যাওয়া যায় কিন্তু নজরের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠিতে হয়। তবে রক্ষা যে, বেশী বাড়াবাড়ি করে না—সামলে আঁতকে উঠে বা হাস্যরস ছড়ায়। কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে, আমি একটা তাদের কাছে রকমারি জিনিস। আমার পোশাক

এখন মন্দ নয়, কারণ শীতের জ্বালায় একটা পা পর্যন্ত লম্বা গরম কোট দিয়ে গেরুয়ার ঝক্‌মকানি ঢাকতে হয়েছে। যখন কোন সভায় যাই তখন কোটটা খুলে রাখি। আমি মনে করেছিনু কেবল আমারই এই দুর্দশা। তা নয়। আমার সব দেশী ভায়াকে নজর শিহরুনি আর মৃদুমন্দ হাসি সহিতে হয়। তবে ইংরেজের পুষ্যিপুত্তুর সেজে হ্যাটকোট পরিলে—কতকটা গোঁজামিল দিলে বেঁচে যাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে নিস্তার নাই। যদি রংটা খুব মটরডালবাটার মতন হয় আর খুব পুষ্যিপুত্তুরি করা হয়—তা হোলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পোশাক যদি অন্যরকম কর—তা রেশমের জুব্বাই পর আর তাজই মাথায় দাও—একেবারে হৈ হৈ পোড়ে যাবে। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, যেমন চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার-দিগকে খোঁচাখুঁচি থেকে বাঁচাবার জন্যে কাঠগড়ার ভিতরে রাখে তেমনি কোরে—অভিষেক উপলক্ষে সমাগত আমাদের দেশীয় সৈন্য-দিগকে এখানে রাখতে হোয়েছিল। তবে বড়মানুষি কোরে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে সাত্ খুন মাপ। ইংরেজ ঐশ্বর্যের কাছে পদানত। কিন্তু একবার আলাপ হোয়ে গেলে এখানকার লোকেরা অতি ভদ্রভাব ধারণ করে—হাসি-টিট্‌কিরি সব ছেড়ে দেয়। কিন্তু যদি আবার একটু মনান্তর হয় ত অমনি blackie nigger, অর্থাৎ কালো সম্ভাষণটা অনেক সময় ইংরেজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে সব ভারতীয় ভায়ারা এই কালো রঙের উপর কটাক্ষের জ্বালায় ত্রস্ত। রাস্তায় একজন ভারতবাসীর সঙ্গে আর একজনের দেখা হোলে এক হাত দূর সাত হাত হয়—পাছে মিল হোলে গোঁজাটা বেরিয়ে পড়ে এবং হাসির পাত্র হোতে হয়। আমাদের দেশে কালোয়-ধলোয় মিল উচ্চ-অঙ্গের মিল—যথা রাধা-কৃষ্ণ—গঙ্গা-যমুনা। কিন্তু সভ্যতার নতুন বাজারে কালোয়-ধলোয় মিশ খাবে না, খাবে না। ভ্রাতৃভাবগ্রস্ত দুচার জন কালো কালো সংস্কারককে একবার বিলেতের রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই তাঁরা ভাবের বুলি ছেড়ে দেবেন। আর বেশী কিছু করতে

হবে না তাঁদের মুখ বন্ধ করাতে। যতদিন সভ্যতার বড়াই ততদিন মিল অসম্ভব।

এখানে একজন দেশী ভাই আছেন—তাঁর স্বদেশের নামে বমি আসে, আর বিলেত এই কথা শুনলেই লাল পড়ে। এর কারণ আছে। সভ্যতার একটা দিক আছে যেটা বড়ই মধুর। এত ছটা ঘটা মাধুরী যে মন একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যায়। একে ত প্রকৃতি অমনিতেই পুরুষকে পেড়ে ফেলেছে, তার উপর আবার রঙ চড়ালে বাঁচা দায়। কলিকাতার জলের কল দেখে একজন বলেছিল—"কি কল বেনিয়েছে কোম্পানি সাহেব।" বিলেত দেখিলে সেইরকম একটা কিছু বলিতে ইচ্ছা যায়। একবার দোকান সাজান দেখিলে মনে হয় যেন রূপের বাজারে এসেছি। মাছের দোকানে মাছ সাজিয়ে রেখেছে—যেন ফুলের কাতার। খুব নিশ্বাস না টানিলে গন্ধ পাওয়া যায় না। অত কথায় কাজ কি—বড় বড় অখাদ্য মাংস এমনি সাজিয়েছে যে, হিন্দুর ছেলে হোয়েও দুচার বার নজর না দিয়ে থাকা বড় মুশকিল। কি মাছ-মাংসের দোকান—কি শাক-সব্‌জির দোকান—কি বসন-ভূষণের দোকান—যা দেখ—যেন চারিদিকে ফুলের মালা গেঁথে রেখেছে। আর শৃঙ্খলার একেবারে চূড়ান্ত। কাতারে কাতার লোক চলছে, একটুও কোলাহল নাই। হাজারে হাজার ঘোড়া গাড়ি দৌড়িতেছে কিন্তু ঠিক যেন কলের পুতুল। একবার যদি পাহারাওয়ালা হাত তোলে ত অমনি সব গাড়ি খাড়া। লণ্ডনের রাস্তায় এত লোক যে মনে হয় বুঝি মেলা বসেছে। তার উপর ট্রাম অমনিবস ভদ্র-লোকের গাড়ি ভাড়াটে গাড়ি বাইসিকল মটরকার বেগে ধাবমান। এত ভিড় কিন্তু ঠেলাঠেলি নাই—চেঁচাচেঁচি নাই—শৃঙ্খলার বিশেষ পরিণতি না হোলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার অত সুনিয়মে চলে না। আর রাস্তা-ঘাট ঘর দুয়ার সব এত পরিপাটি যেন ঝকমক করিতেছে। বাড়িগুলি যেন এক-একখানি ছবি। আমাদের কলিকাতার চৌরঙ্গী বা ইংরেজটোলা লণ্ডনের ভাল জায়গার একটি মেকি—কাপি বা

অনুকরণ। আর আয়েসের কথা কি বলিব। খাওয়া-দাওয়া নাওয়া-শোয়া বসা-দাঁড়ান সব কাজে এত আরাম কোরে তুলেছে যে ইন্দ্র-লোকে এর চেয়ে আর কি হোতে পারে তা ত ভেবে পাওয়া যায় না। আমি এখানে দুটি আরাম সম্ভোগ করেছি। স্নান আর ক্ষৌরি। ক্ষৌরির কথাটাই বলি। একটি পাথরের টেবিল—তার উপরে একখানি প্রকাণ্ড আয়না। সম্মুখে একখানি কেদারা। কেদারার পিছনটি স্প্রিং-এ উঠান-নামান যায়। তাহাতে অর্ধেক চিৎপাত হোয়ে ঠেসান দিয়ে বসিতে হয়। তার পরে সাহেব নাপিত "Good-morning" গুডমরনিং কোরে ঈষদুষ্ণ গরম জলে গোলা সুগন্ধ সাবান বুরুস দিয়ে—দাড়ি ও গোঁফ ঘষে ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। পাঁচ-সাত মিনিট ফুলের মতন বুরুস বুলিয়ে ক্ষুর ধরে। ক্ষুর এমনি দাড়ির উপর চালায়—যেন তুলি। তার পরে আবার সাবান ঘষা। আবার উজান কামানো। কামিয়ে একটা নরম স্পন্‌জ গরম ও ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে—ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল পাথরের টেবিলে লাগান আছে—মুখে বুলায় ও সাবান পুছিয়ে দেয়। তার পর এসেন্সের পিচকারি—আবার তার উপর পাউডার। এত কারখানা—আর তুমি মজা কোরে বোসে বোসে আয়নাতে দেখ—সাহেব পরামাণিক কেমন তোমায় কেয়ারি করিতেছে। কি যে আয়েস তা বুঝিয়ে উঠা দায়—তবে পিচকারি ও পাউডারের সুখটা আমি ভোগ করি নাই—কেন-না ওটা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। এত বিলাস সুখ এখানে আছে কিন্তু নিষেধের জ্বালায় সে সব অঙ্গীকার করিতে পারি না। বঙ্গবাসীর আর কেহ পত্রলেখক হোলে ভাল হোতো। কত নাচ-তামাসা আহার-পানের মজা। কিন্তু আমার কপালে তা নাই।

উদ্দাম-প্রবৃত্তি যুবকদের প্রথম দৃষ্টিতে মনে হোতে পারে যে ভারতে না জন্মানই ভাল ছিল। তাই দেখা যায় যে, যত যুবক এখানে আসে—অধিকাংশই সাহেব হোয়ে সাহেবি বিলাসিতায় ডুবে মরে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে মোহ ঘুচে যায়। এখানকার গৃহস্থদের জীবনে

শান্তি নাই। এত বেশী জিনিস-পত্তর দরকার যে তারা কুলিয়ে উঠিতে পারে না। আর দিন্‌কের দিন খুটিনাটি বাড়ছে। আমি অতি সামান্য রকমে একটি গৃহস্থের বাটীতে থাকি। তবু আমার বাসাভাড়া ও খাবার জন্যে মাসিক ৬৩৲ দিতে হয়। আমার একটি বসিবার ঘর ও একটি শোবার ঘর। ঘর দুটি ছোট ছোট কিন্তু এমনি সাজান যে কলিকাতার বড় মানুষের বৈঠকখানা হোতে কোনো অংশে কম নয়। টেবিল কেদারা কোচ দেরাজ ও ভাল ভাল ছবিতে বসিবার ঘরটি সুশোভিত। নীচে কারপেট—জানালায় সাপের খোলসের মতন পরদা। শোবার ঘরে স্প্রিং-এর খাট—শুইলেই এক হাত নেবে যায়—তায় আবার গদির উপর গদি। একদিন একটা পরদা কি রকম লাগান হয় নাই—তাই গৃহিণী আমার নিকট ক্ষমা চাহিতে এসেছিল। আমি মনে করিলাম ভাল রে ভাল—তোমার পরদা কোচ সরিয়ে নিয়ে যাও—আর কিছু ভাড়া কমিয়ে দাও। কিন্তু এখানে এর চেয়ে সস্তা বাসা পাওয়া যায় না। আর যাদের স্ত্রী-পুত্র আছে—তাদের যে কত কি আবশ্যক, তার অবধি নাই। তাই এখানে ভদ্রলোকেরা ব্যস্ততার চক্রে পিষ্ট। জীবন ধীরে সুস্থে চালালে চলে না। যেন কেবলই ভিড় ঠেলে চলিতে হয়। আমাদের দেশেও এইরূপ দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। তবে সেখানে একমুষ্টি অন্নের জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় আর এখানে সাপের খোলসের মতন চিকণসই পরদা ও দারা-সুতের নিমন্ত্রণ খাইবার পোশাকের জন্য ছুটোছুটি করিতে হয়। আমাদের যেমন এক-মুষ্টি অন্ন তেমনি এদের পরদা ও বিলাস বেশ—নহিলে মানসম্ভ্রম একেবারে থাকে না।

আর একটি বড় ভয়ের কথা। এখানকার কর্মজীবী লোকেরা বড়মানুষদের উপর বড় চটা। সেদিন একটি মকর্দমায় একজন বড় ঘরের মেয়ের ৭৫০৲ টাকা জরিমানা হোয়ে গেছে। এঁর একটি পাগলাটে কন্যা আছে। ইনি তার প্রতি বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। তাই বালক-বালিকার প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা এঁর নামে নালিশ

করেছিল। এ আবার বিলাতের এক উদ্ভুট্টে ব্যাপার। মা-বাপ যদি একটু কড়া হয় ত অমনি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভার হাতে পড়িতে হয়। যা হউক—জজ এই নিষ্ঠুর মাতাকে কেন জেলে দিলেন না—কেবল জরিমানা করলেন—এই নিয়ে একেবারেই হুলুস্থূল পড়ে গেল। কর্মজীবীরা সংবাদ-পত্রে ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে, কেবল বড়মানুষের ঘর বোলে এই অল্প সাজা দেওয়া হয়েছে—আমাদের ঘর হোলে নিশ্চয়ই জেল হোতো। জজকে একেবারে উস্তম ফুস্তম কোরে তুলেছিল। ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে বড়মানুষে আর গরিবে একটা ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব দাঁড়াইতেছে। এখানে একটি কর্মজীবীদের বিদ্যালয় আছে। দেশ-বিদেশ হোতে ছুতার রাজমিস্ত্রী কামার দরজি—এইরূপ লোকেরা এসে পড়াশুনা করে। তারা একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছে। কিন্তু তাদের বড়মানুষদের উপর যে রাগ দেখলাম তাতে বড় ভয় হয়। এরা ভাল লোক কিন্তু দায়ে পোড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে, এরা সামলে উঠতে পারে না। তাই এরা বর্তমান সমাজের দ্রোহী হোয়ে উঠিতেছে। আর যাদের তেলা মাথায় তেল—এরা তাদের দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। আমি ইহাদিগকে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের কথা অল্পস্বল্প বলিলাম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িয়া কৌলিক কর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা শুনিয়া ইহারা বিস্মিত হইল কিন্তু ইহা যে শান্তিপ্রদ তাহা বার বার স্বীকার করিল। ইহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। এই সমাজদ্রোহিতা—সভ্যতার একটি অঙ্গ। ইহাই ধমঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্মীতে শত্রুতা বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সে-ই খুব মেরে দেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকিলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্য-ভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই ত গেল ভয়ের কথা। সভ্যতার একটি শোচনীয় ব্যাপার আছে। সেটি ভয়ানক দারিদ্র্য। শহরে ভারি শোভা—পূর্ণমাত্রায় আয়েস ঐশ্বর্য—কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের অলিতে গলিতে বড়ই দারিদ্র্য। দেখিলে প্রাণ ফেটে যায়। ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘর—তাতে স্বামী-স্ত্রী-ছেলেমেয়ের গাদাগাদি। ঘোর শীতে অগ্নি নাই—এখানে ঘরে আগুন নহিলে তিষ্টিবার জো নাই—বস্ত্র নাই আহার নাই। সকলে কাজ করিবার জন্য লালায়িত কিন্তু শহরে কাজকর্ম পায় না। এমন একজন আধজন নয়—শত শত সহস্র সহস্র। এই অমরাবতীর ঐশ্বর্যের মধ্যে কত লোক শীতে ও অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। কী দুঃখের কথা—কী লজ্জার কথা—আবার এমনই চমৎকার আইন যে ভিক্ষা করিবার হুকুম নাই। রাস্তায় দেখিতে পাইবে যে দীনহীন রমণীরা ছেলে-কোলে শীতে হি-হি কোরে কাঁপছে আর দুই-একটা শুক্‌নো ফুলের তোড়া বা ভাঙ্গা দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রি করবার ছল কোরে ভিক্ষা চাহিতেছে। বড় বড় ঘাঘরা—বড় বড় টুপি কিন্তু তাহাদের পানে কেহ ফিরেও চায় না। সেদিন একজন রমণী আমার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলের তোড়া বিক্রি করতে এলো। আমি ভারি গরীব তবুও তাকে এক শিলিং—বারো আনা দিলাম। কিন্তু অমনি একজন ইংরেজ নারী বোলে উঠল—ছি—কালোমানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নিলি। যাহা হউক, এত ধনের মধ্যে অনাহারে মরে যায়—ইহাই বড় প্রাণে লাগে। সেদিন দুইটি স্ত্রীলোকের কথা শুনে অশ্রুবারি সংবরণ করিতে পারি নাই। তারা দুটি বোন। একজন অনাহারে মরে পড়ে আছে আর একজন ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষেপে গেছে। পুলিশ এসে মরা ও ক্ষেপা দুজনকে বের করে নিয়ে গেল। এমন সভ্যতার মুখে ছাই। আমি ত দেখে শুনে ধিক্কারে মরি। আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রংচং-এ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি আমাদেরই ইষ্টদেবতা—ঠেলাঠেলি মারামারিতে আমাদের কাজ নাই। জিগীষার কাড়াকাড়ি হোতে ভগবান্

রক্ষা কর। হিন্দুসন্তান সভ্যতার প্রবৃত্তিপরায়ণতা হোতে বাঁচুক ও নিষ্কাম হইয়া কুল-ধর্ম পালনে রত হউক।

বিলেতে এসে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না। সাংখ্যদর্শনে বলে যে প্রকৃতি যখন অবগুণ্ঠন খুলে আপনার স্বরূপ জানায় তখন পুরুষের মুক্তি হয়। এখানে প্রকৃতি অবগুণ্ঠিতা নহে। মাঠে ঘাটে হাটে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখে। এখানকার পুরুষেরা তবে সাংখ্যমতে মুক্ত। সাংখ্যমতে হউক আর না হউক আমাদের বিলাত-প্রবাসী দেশী ভায়াদের মতে সাহেবেরা মুক্ত পুরুষ। কেননা প্রকৃতিকে তারা অবাধে দেখে। এইরূপ মুক্তি দেশে আমদানী করিবার জন্য এরা ব্যস্ত। বাস্তবিক এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একটা অদ্ভুত কাণ্ড। আমাদের দেশে যে নাই তাহা নয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যায়—বাজার করে, ঘুরে ফিরে বেড়ায়। কিন্তু এখানে রকমই আলাদা। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা চলেছে—কেহ দৌড়িতেছে—কেহ হাসিতেছে— ভ্রূক্ষেপই নাই। আবার কত স্বামী-স্ত্রী হাতধরাধরি কোরে চলেছে। যুগল মূর্তি দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু যুগল মূর্তির বিশেষ খেলা প্রণয়-সূত্রে চলে—পরিণয়-সূত্রে নহে। প্রায়ই দেখা যায়—কুমার-কুমারীরা বাহুবন্ধনে মিলিত হোয়ে বিহার করিতেছে—কিংবা আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে বা বোসে রয়েছে। আমি একটু নির্জন জায়গা পছন্দ করি। তাই অপরাহ্নে প্রায় ঝোপঝাড় ঘেঁষে বেড়াইতে যাই। বাগানে এ সব ঝোপ তৈয়ারী করা। কিন্তু ক্রমশঃ দেখি যে সবগুলিই প্রেমালাপে পরিপূর্ণ। তাই আমাকে এখন সামলে চলতে হয়। কিন্তু এখানকার লোকেরা প্রণয়ের সূতো পাকানকে একটা অবশ্যকর্তব্য মনে করে। যাহাদের বিবাহ স্থির হোয়ে গেছে তারা অত ঘোরাঘুরি করে না। কিন্তু বিবাহ স্থির কি অস্থির—সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই পুরুষপ্রকৃতি কুঞ্জপুঞ্জের বিরলতা খোঁজে। ইহা ভাল কি মন্দ—তার বিচার আবশ্যক নাই। তবে আমাদের দেশে এই প্রণয়ের

করপীড়ন বা উৎপীড়ন যাতে না রপ্তানী হয়—সেই দিকে দৃষ্টি থাকিলেই ভাল।

আগামী বারে উক্ষপারের বিবরণ লিখিব মনে করিতেছি। ইহা একটি অতি পুরাতন বিদ্যালয়ের স্থান। বাইশটা না তেইশটা কালেজ আছে। এক একটা কালেজ পাঁচ-সাত শত বৎসরের। স্থানটি অতি রমণীয়।

উক্ষপাব
তারিখ ২বা জানুযাবি, ১৯০৩

দুই

অক্ষফর্ড নগরকে সংস্কৃত ভাষায়—উক্ষপার—শব্দে অভিহিত করিলে মন্দ হয় না। ইংরেজিতে অক্‌স্‌ অর্থে উক্ষ—আর ফোর্ড অর্থে পার। তা হোলে অর্থ ত বজায় থাকেই আর শাব্দিক মিলও কতকটা হয়। নগরটি তিন দিকে দুইটি নদীর দ্বারা বেষ্টিত। নদী দুটি আট-দশ হাত চওড়া হবে। স্রোত অতি মৃদু এবং জল সুনির্মল। নগরের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। কতকগুলি গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশই ছাত্রদের ক্রিকেট বা ফুটবল বা গল্‌ফ খেলিবার নিমিত্ত অতি যত্নে ও ব্যয়ে সুরক্ষিত। মাঠের অপর পারে আবার শ্যামলবৃক্ষাচ্ছাদিত ছোট ছোট পাহাড়। নদী, মাঠ ও পাহাড়—তিন মিলে স্থানটিকে অতি রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। পুরাকাল হোতে এই জায়গায় বিলাতী সন্ন্যাসীদের (মঙ্ক) বড় বড় মঠ ছিল। সেই মঠের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের জন্য আয়তন (কালেজ) নির্মিত হইয়াছিল। কালেজ কথাটির ধাতুগত যে অর্থ—আয়তনেরও সেই অর্থ। সংস্কৃতে কালেজকে আয়তন বলে—সেটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ধনবান ভক্তেরা ছাত্রদিগের আবাস নির্মাণ করিয়া

দিত এবং ভরণপোষণের জন্য বিপুল অর্থ দান করিত। এইরূপে উক্ষপারে অনেক কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে এক ভয়ানক ধর্মবিপ্লব ঘটে। সেই অবধি ইংরেজ জাতির মনে সন্ন্যাস-আশ্রমের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা সন্ন্যাসীদিগকে দূর করিয়া দিয়া মঠ সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ও দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত কবিয়াছেন। কাজে কাজেই আয়তনগুলি এখন সরকারি খাসে আসিয়াছে। এই মঠ ভাঙ্গার পর আরও গুটিকয়েক কালেজ হইয়াছে। এখন এখানে সর্বসুদ্ধ তেইশটি কালেজ। প্রত্যেক কালেজেই ছাত্রাবাস আছে। তবে সকল ছাত্রেরই থাকিবার জায়গা হয় না। বাকি ছাত্রেরা বাসা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বাসা সকল কর্তৃপক্ষেব দ্বাবা নির্দিষ্ট হয় ও কতক পরিমাণে শাসিত হয়। কতকগুলি লোক নিযুক্ত আছে—যাহারা ছাত্রদের বাসার তত্ত্বাবধান করে এবং রাস্তা ঘাটে তাহাদের চাল-চলনের উপর নজর রাখে। তবে ছাত্রদেব স্বাধীনতা স্বেচ্ছা-চারিতা খুব। অধ্যাপকদের সামনে খুব চুরুট টানে ও তামাক (পাইপ) ফোঁকে। তারা থিয়েটারে প্রায়ই যায় ও সেখানে গিয়ে এমনি বেলেল্লাগিরি করে যে দেখে পিলে চমকে যায়। অধ্যাপক মহাশয়েরা সেই রসরঙ্গের ভিতর ডুবে লুপ্তপ্রায় হোয়ে বোসে থাকেন। ছাত্রেরা সুরাপান করে কিন্তু মাতাল হোলেই শাস্তি পায়। তবে কখন কখন নেশাটা একটু গোলাপীরকম হোলে ছাত্রমহাশয় দরজা জানালায় খড়খড় শব্দ বোরে অধ্যাপকদের ভীতি উৎপাদন বা নিদ্রাভঙ্গ করিতেও ছাড়েন না। বিলাতী সভ্যতা এইরূপই।

এখানে শীতকালে আটটার সময় সূর্য উঠে। তবে প্রায়ই উঠে না—মেঘে ঢাকা থাকে। আটটার সময় ছেলেদের গির্জা হয়। বেলা নয়টার সময় আহার। দশটা হইতে একটা পর্যন্ত কালেজ। আবার আহার। তার পর দুটা থেকে চারিটা পর্যন্ত খুব খেলা বা নৌকা-বাহন—যাহার যা ইচ্ছা। পাঁচটার সময় চা পান। আবার তার পর

গির্জা। সাতটার সময় শেষ আহার (ডিনার)। এই রাত্রি-ভোজনের পর ছেলেরা প্রায়ই সব বেড়াতে বেরোয় বা থিয়েটারে যায়। রাত বারটার মধ্যে কিন্তু সকলকেই ফিরে আসতে হয়। এখানে খেলা আমোদটা খুব অধিক। পড়াশুনাব চাপ বড় বেশি নয়। তুই মাস করিয়া পড়া হয় আর পাঁচ হপ্তা ছুটি। আর গ্রীষ্মকালে একটা মস্ত লম্বা চারি মাসের অবসর। প্রত্যেক কালেজে একজন কোরে অধ্যাপক (Tutor) আছেন—যিনি ছেলেদের অধ্যয়ন-বিষয়ে সাহায্য করেন ও কোন্ কালেজে গিয়ে কোন্ বিষয়ের বক্তৃতা শুনিলে ভাল হয়—তাও ঠিক করিয়া দেন। একটা কালেজে হয় ত ইতিহাস ভাল হয় আর একটা কালেজে হয়ত দর্শন বা ন্যায় ভাল। ছেলেরা এ-কালেজ থেকে ও-কালেজে ছুটোছুটি করে আব ভিন্ন ভিন্ন কালেজের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনে। তেইশটা কালেজ বটে—তবে সর্বসুদ্ধ বোধ হয় তু হাজার ছেলে হবে।

এখানে ‘বডলিয়ান লাইব্রেরি’ নামে একটি পুস্তকাগার আছে। তাহাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ পুস্তক। বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রত্যেক পাঠককে টেবিল চেয়ার দোয়াত কলম ও কাগজ দেওয়া হয়। একখানি কাগজে পুস্তকের নাম ও নম্বর (তালিকায় সব ঠিক করা আছে) লিখিয়া দিলেই অমনি একজন কর্মচারী পুস্তকখানি দিয়া যায়। এখানে বড় বড় লোকেরা আসিয়া লেখাপড়া করে। অনেকে আসে যায় কিন্তু টুঁ শব্দটি নাই। ইহা সরস্বতী দেবীর একটি পীঠস্থান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পড়িবার জন্য একটি কপর্দকও দিতে হয় না। কেবল একজন মেম্বরের দ্বারা উপনীত হইলেই হইল। বাস্তবিক একবার এখানে গেলে আর সহজে ফিরে আসিতে ইচ্ছা করে না।

যারা শ্রমজীবী বা মসীজীবী নয়—তারা সকলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বেড়াতে যায়। আমিও তার মধ্যে একজন। এখানের একটি সুবৃহৎ উদ্যান আছে। হন্ হন্ কোরে চলিলে পনেরো মিনিটে ঘুরে

আসা যায়। ইহা একেবারে নদীর ধারে। মাঝখানে মস্ত মস্ত খেলার মাঠ আর চারিধারে বৃক্ষলতা। এই উদ্যান হইতে একটি সুদীর্ঘ পথ বাহির হইয়াছে। এই পথটির দুইধারে নদী। ছেলেদের নৌকা বাওয়ার সুবিধার জন্য ক্রোশখানেক ধোরে নদীটিকে আটকের দ্বারা ফাঁপিয়ে সদাই জলপূর্ণ কোরে রাখা হয়। তাতে যে জল উপচে উঠে তাহা পরে একটি খালের দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই খালটি আটকের কাছে গিয়ে আবার নদীতে মিলেছে। নদী ও খালটির মাঝখানে এই পথটি তৈয়ারী। ইহার দুই পার্শ্বে সারি সারি এলম্ গাছ। শীতে এখন গাছগুলিতে একটিও পাতা নাই। এই পথটি অতি নিভৃত শান্ত। আমি এই রাস্তায় প্রায় বেড়াইতে যাই। এ রাস্তা ছাড়িয়ে একটা ছোট পাহাড়ে উঠি। আবার পাহাড় থেকে নেমে নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামে যাই। যাওয়া-আসাতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। পল্লীগ্রামে চারিদিকে ক্ষেত ও বাগান। এমন আধ হাত জায়গা দেখিতে পাওয়া যায় না, যার উপর মানুষের কারিকুরি নাই। গোচারণের মাঠগুলির ঘাসও বেশ কেয়ারী করা। চারিদিক একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতিকে ছেঁটেছুঁটে দোরস্ত কোরে যেন সাজানো হোয়েছে। প্রথমটা দেখিলে বড় ভাল লাগে। তার পরে কিন্তু মনে হয়—খোদার উপর কিছু বেশি মাত্রায় খোদকারী করা হোয়েছে। স্বভাবের স্বাভাবিক শোভাটা লোপ পেয়েছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কত-না বন-জঙ্গল। কিন্তু তাতে একটা পরমানন্দের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়—যেন সৌন্দর্যের মেলা লেগেছে—শ্রীনিবাস যজ্ঞি ফেঁদে বোসেছেন—ফেলাফেলি ছড়াছড়ি। আর এখানে যেন হিসাব কোরে গুণে-গেঁথে ফুল-ফল-শস্য-গাছপালা আমদানী করা হোয়েছে।

লোকে বিলাতের শীতের বিষয়ে আমায় বড় ভয় দেখিয়েছিল। আর এখানে আমার সাহেব বন্ধুরা প্রায়ই আমায় দয়াপ্রকাশ কোরে বলেন—শীত সহিতে পারিতেছ ত। আমার কিন্তু মনে হয়—পঞ্জাবে

এখানকার চেয়ে শীত অধিক। এখানে আমি যদি একটু বেড়িয়ে আসি ত অমনি দরদর কোরে ঘাম পড়ে। ঘরে সদাই আগুন জ্বালাতে হয় কিন্তু আমার ত তত আবশ্যক বোধ হয় না। আমি সাতটার সময় উঠি আর একচক্র ঘুরে আসি। তখন অন্ধকার, ঠিক যেন আমাদের দেশে পাঁচটা বেজেছে। আর আমার কাপড়চোপড়ের অবস্থা তথৈবচ। তার উপর আবার মাংস মদিরা খাই না। লোকে বলে তোমার ধাতে গরমি বেশী। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি আমার মেজাজ একেবারেই গরম নয়। এখানকার শীত আমার বেশ লাগে। আমার শরীর বড় ভাল আছে। বোধ হয় যেন দশ বৎসর পরমায়ু বেড়ে গেছে। তবে পয়সার অভাবে ভাল কোরে দুধ ও ফল খেতে পাই না। তা না হোলে বোধ হয় বিশ বৎসর বেড়ে যেতো। যাক্— বড়াই করিব না। নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ—অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়। কেবল মনে মনে বড় রাগ হয় যে, এখানে দিনের পর দিন চলে যায়—তবু সূর্য উঠে না। আকাশ সদাই মেঘে ঢাকা। যদি এক-দিন সূর্য উঠিল ত লোকের মুখে আর হাসি ধরে না। সূর্যের তাপটা কিন্তু কি রকম। বেলা একটার সময় যেন কলিকাতার আটটা বেজেছে। তাই তাদের হাসি দেখে আমার হাসি পায়।

আমার চেহারাটা ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছে। আমি চুনোগলি ছাড়িয়া চৌরঙ্গীর ঘেঁষাঘেঁষি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিতে পারি। তবু আমায় দেখে রাস্তায় শিহরুণি-আতকানি-হাসি ঘোচেনি। এখানে একজন ভারতবাসী আছেন। ইনি ঝনুঝনে সংস্কারক। ইংরেজদের উপর খুব টান। এঁর রঙটা একেবারে নবজলধর-শ্যাম। কিন্তু আমার কাছে এর বায়নাখ্যা ভাঙ্গেন নাই। সেদিন আমি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনিও আমায় খুলে বললেন যে মাঝে মাঝে ছেলেদের দল একে তাড়া করে। আমার কপাল ভাল যে, অতটা দুর্দশা এখনও হয় নাই। ইংরেজের উপর বেশি টান বোলেই বুঝি এঁর সঙ্গে এত টানাটানি। ইনি ইংরেজের মতন পোশাক করেন। তবে

যেদিন নাইট ক্যাপ (Night-Cap) ছেড়ে কালো রঙের উপর লাল পাগ্ড়ি চড়ান সেদিন একেবারে—ত্রাহি মধুসূদন।

এই বিদ্যার পীঠস্থানে কতকগুলি মহাবিদ্যা আছেন—যাঁরা কেবল নূতন খুঁজে বেড়ান। এঁরা ভারতবাসীদের সঙ্গে ভাব করিতে বড় অভিলাষিণী। কেহ প্রবীণা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ মধ্যম-বয়স্কা, কেহ-বা যুবতী। এঁদের চালচলনে শীলের কোন অভাব নাই। কিন্তু দেশের সমাজ বা সমাজ-বন্ধন -এঁদের ভাল লাগে না। ছট্‌কে বেরুতে পারিলে এঁরা বাঁচেন। আমায় দুই-একবার নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন। কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় সব হোলো কিন্তু আমি বড় ঘেঁষ দিই না। সব সওয়া যায়, কিন্তু যারা নিজের দেশের উপর চটা—যে দেশেরই তারা হোক না কেন—তাহাদিগকে সওয়া যায় না। এরকম পুরুষও অনেক আছে। উক্ষপারে যাঁরা বিদ্বান্ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন—তাঁরা ভারতের উপর বিশেষ ভক্তিমান্ নহেন। তবে গুর্‌খা ও শিখ ভারি যোদ্ধা আর রাজা-রাজড়ারা রাজভক্ত- এইটুকু স্বীকার করেন।

মাইণ্ড (অর্থাৎ মনঃ) নামক একটি দার্শনিক পত্র আছে। যত বড় বড় ইংরেজ দার্শনিক—তাঁরা সকলেই ইহাতে লিখেন। হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান—নামক আমার বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে লিখে মাইণ্ডের সম্পাদকের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে প্রবন্ধটি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না—কেননা তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য এক বৎসরের কপি জমে পোড়ে আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বেদান্তের কথা শুনে হেসে বলিলেন—খুব একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু এখনকার কালে ওসব চক্ষুবুজুনি দর্শন আর চলিবে না।—কথা চলিতে লাগিল। কিছু আকৃষ্ট হোলেন। আমায় আর একদিন কথাবার্তার জন্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার প্রবন্ধটা রেখে এলাম। তার পরে যেদিন গেলাম সেদিন তিনি বলিলেন—প্রবন্ধতে নূতন কথা আছে—যে রকম ব্যাখ্যা করা হোয়েছে তাতে বোধ হয়—বেদান্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত—

আমি এ প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।—আমার প্রবন্ধে জীব ও জগৎ যে মিথ্যা ও মায়ার রাজ্যে যে কোন স্বাধীনতা নাই—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যে মায়িক অলীকতার প্রতিবাদ আছে তাহারও খণ্ডন করা হইয়াছে। যাহা হউক আনন্দের বিষয় যে, আমার প্রবন্ধ মাইণ্ডের মতন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় বাহির হইবে। আরও আরও অনেক বিদ্বান্ এখানে আছেন যাঁরা দেশের মাথা—কিন্তু ভারতের দর্শন-জ্ঞান তাঁদের কাছে কোন পুরানো কালের বৃহৎ জন্তুর (ম্যামথের) মত—মিউজিয়মে রেখে দিবার জিনিস। মোক্ষমূলর অনেক দিন উক্ষপাবে পরিশ্রম করিয়াছেন বটে কিন্তু তার ফল দাঁড়িয়েছে যে বেদ অল্প-অল্প-সভ্য কৃষকদের গান—উপনিষদ সকল প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষামাত্র—বর্ণাশ্রমধর্ম ব্রাহ্মণদের অত্যাচার—যা কিছু ভারতবর্ষের সার তা বৌদ্ধধর্ম আর জগৎ অলীক—এটা খুব সাহসের কথা বটে তবে প্রলাপ। বেদান্তের মহাবাক্য—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও যেমন রজ্জু ভ্রমবশত সর্পরূপে প্রতিভাত হয় তেমনিই ব্রহ্মই অবিদ্যাপ্রভাবে দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত—এই সার কথা কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছেন কি না—সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। যে সন্ন্যাস-পারম্পর্য ধরিয়া এই অদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে তাহার সঙ্গ না করিলে বেদান্ত-বোধ সুদুর্লভ।

যাঁহারা সমাজদ্রোহী নহেন—প্রতিষ্ঠাবান সুধী—তাঁহারা যদি হিন্দু-দর্শন-চিন্তার সমাদর করেন তবে সুফল ফলিবে। কিন্তু এ সফলতা হুড়ুদ্দুমের কাজ নয়। ইংরেজ সহজে ভেজে না। তুড়ি দিয়ে যে উড়িয়ে দেবে—তা হবে না। আর আমার মত সামান্য লোকের দ্বারা ত কিছু হবেই না।

আমার বিশ্বাস যে ভারত জ্ঞানবলে বিশ্ববিজয়ী হইবে। এই বিশ্ববিজয়ী ইংরেজকে অগ্রে জ্ঞানযোগে জয় করিয়া আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া চাই। ইতি—

৯ই জানুয়ারি, ১৯০৩

তিন

আমি গতবারে লিখিয়াছি যে, পঞ্জাবে এখানের চেয়ে শীতের প্রকোপ অধিক। তিন চারি দিন থেকে আর তাহা বলা চলে না। একেবারে হাড়ভাঙা শীত পড়েছে। গত সপ্তাহে দু তিনদিন বৃষ্টি হয়। সেই জন্য নদী উপচে উঠায় তটস্থ মাঠগুলি জলময় হোয়েছিল। শীতের চোটে মাঠের জল সব জমে বরফ হোয়ে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারধবল ভূমিখণ্ড সূর্যকিরণে রঞ্জিত হোয়ে, অপ্সরাদের নর্তন-প্রাঙ্গণের ন্যায় দেখাইতেছে। যথার্থই এখানে নৃত্য হয়। চক্রবিশিষ্ট কাষ্ঠ বা লৌহ পাদুকার সাহায্যে নরনারী এই বরফের উপর দিয়া রথের মত ঘর্ঘর শব্দে অতিবেগে ছুটিয়া বেড়ায় বা ঘুরপাক খায়। নদী দুটি প্রায় জমে এসেছে। আর দু-এক দিন এই রকম ঠাণ্ডা থাকিলেই চলে পারাপার হওয়া যাবে। কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়াছিলাম। বরফের বড় বড় থান নিয়ে নদীর মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিলাম। সব চুরমার হোয়ে গেল—কেননা মাঝখানেও জল পাথরের মত জমে গেছে। আমার খুব ফুর্তি। শীত বেশ মিঠাকড়া লাগল। আর আমি একেশ্বর রাজার মত বিহার করিতে করিতে আনন্দে ডুবে গেলাম। একেশ্বর—কেন না ঠাণ্ডায় লোকজন অতি অল্পই সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিল। ইংরেজেরা ভারি শীতকাতুরে। মদ খায় মাংস খায়—তবু হি হি হি করে; আর আগুনের কাছে বসিতে পারিলে বাঁচে। আমার শীতসহিষ্ণুতা দেখে এরা বিস্মিত হয়। গতকল্য দু-জন ইংরেজ থিওসফিস্টের সঙ্গে খুব আলাপ-পরিচয় হইল। আমায় শীতে কাবু করিতে পারে না দেখে একজন আভাস দিলে যে, আমার বোধ হয় যোগবল আছে। আমি যদি কথাটাতে সায় দিয়ে একটু গম্ভীর ভাবে যোগমাহাত্ম্য বর্ণন করিতাম তা হোলে খাতিরটা বোধ হয় একটু

জমিত। অমনিতেই যথেষ্ট হোয়েছিল তাই আর ভান করিবার প্রয়োজন ছিল না।

গেল সোমবারে এখানকার একজন অধ্যাপক আমায় গাড়ি কোরে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মাথায় মলিদার টুপি ও গায়ে পীতবর্ণের বনাত ছিল। রাস্তায় বড় বাহার হোয়েছিল—লোকে হাঁ করে দেখিতে লাগিল। গোটাকতক ছোঁড়া হো হো করে হেসেও উঠিল। আর আমি ফব্ ফব্ করে ইংরেজি কথা কহিতেছি দেখে মেম-সাহেবেরা একেবারে অবাক্। এইরূপ ধবলশ্যাম যুগলমূর্তি অশ্বযানে অতি দ্রুতবেগে চলিলাম। দেড় ক্রোশ দূরে লিটল্-মোর নামক এক গ্রামে আমরা উপনীত হইলাম। এই গ্রাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরকালই প্রসিদ্ধ থাকিবে। এখানে স্বর্গীয় নিউম্যান বাস করিতেন। ইনি একজন ধর্মবীর। ইংলণ্ডে ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তার গতি —বিশ্বাস ও ভক্তির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন সেই গৃহে আমরা গেলাম। সেখানে এখন আর একজন অধ্যাপক বাস করেন। ভিতরে গিয়া দেখি যে, মল্লিখিত এক ইংরেজি প্রবন্ধ মেজে খোলা রহিয়াছে ও পাতায় পাতায় পেন্সিলের আলোচনা ঘন-সন্নিবিষ্ট। অধ্যাপক আসিয়া উহা সম্ভাষণ করিয়া আমার সহিত মায়াবাদ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমার তখন বেড়াবার শখ চেপেছে। আমি তাঁকে আর একদিন আসিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইলাম। প্রবন্ধে মায়ার বিষয়ই লেখা ছিল। মায়া কথাটা শুনিলে ইংরেজ চমকিত ও স্তম্ভিত হয়। আমরা দীন হীন জাতি—আমাদের বাঁচা-মরা শালগ্রামের শোয়া-বসার মতন দুই সমান। জগৎকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা মনে হয়। অনেক মারপেঁচ কোরে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না। কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হবে। আমাদিগকে পরাজয় কোরে তারা সম্রাট হয়েছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার

ফাঁকি আর কিছুই নয়—এই স্বীকার কোরে একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হোতে হবে ও জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করতে হবে। ইংলণ্ডে অল্পস্বল্প বেদান্তের কথা রটেছে কিন্তু যাঁরা রটান তাঁরা মায়ার বাঁধে এমনি আটকেছেন যে, মায়াবাদে আর পঁহুছিতে পারেন না। পুরুষেরা অবিদ্যাকে সদ্বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর অবিদ্যারা পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া মাথায় চড়িয়া বসিয়াছেন। কাজেই একটা কিম্ভূতকিমাকার গাউন-পরানো বেদান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। তবে রক্ষে যে বিলাতি-মার্কা মায়াবাদের বা মায়া-সাধের প্রাদুর্ভাব অতি কম।

যাহা হউক সেই গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা গ্রামান্তরে গেলাম। চাষাভুষা দেখে মনে ধারণা হয় যে, ইংরেজেরা আমাদের মতনই মানুষ। সেই চাষ করে, মরাই বাঁধে, গরু চরায়। তবে চারি কোটি না পাঁচ কোটি লোক ধরাখানাকে সরা কোরে তুলেছে কেমন কোরে। ঐক্য ও পুরুষকারের জোরে। সমস্ত ইংরেজজাতির মধ্যে একটা বাঁধন আছে—সেটা কিছুতেই ছেঁড়ে না। এত ভয়ানক দলাদলি ও রাগা-রাগি যে তার সিকির সিকিও আমাদের দেশে নাই। অনেকেই ত রাজমন্ত্রীদিগকে ও গভর্ণমেণ্টকে গাল দিয়া ভূত ভাগায়। কিন্তু বিধিপূর্বক আইন পাস হইলেই সব ঠাণ্ডা। অনেকেই প্রতিবাদ করে কিন্তু বিধি কিছুতেই লঙ্ঘন করে না। ইংরেজের নিজের জাতির উপর ভারি টান। বুয়র যুদ্ধে স্বদেশীয়ের রক্তপাত হোয়েছে শুনে গভর্ণমেণ্টের শত্রুরা সব মিত্র হোয়ে গেল ; আর বুয়র পরাজয়ে এক প্রাণ হয়ে উঠে পড়ে লাগল। এই ত গেল একতা। ভাল কোরে পর্যবেক্ষণ কোরে দেখলে বুঝা যায় যে ইংরেজের—তা কৃষকই হউক বা বণিকই হউক বা অধ্যাপকই হউক—চোখে মুখে পুরুষকার মাখান। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করিতে সবাই বদ্ধপরিকর। এইরূপ প্রকৃতিজয়ে বেশ একটা নিষ্কাম ভাব আছে। যদি ইংরেজ মনে করে যে, অমুক তারিখে কোন তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশিখরে ধ্বজা গাড়িবে—

তাহা হইলে সেই দিনে সেই দুরারোহ স্থানে কেশরী চিহ্নিত নিশান পত-পত করিয়া উড়িবেই উড়িবে। উত্তর কেন্দ্রের অপর পারে কি আছে দেখিব—প্রাণ যায় বা থাক। কত জাহাজ তুষারগর্ভে বিলীন হইল—কত লোক মরিল—তথাপি আবিষ্কার করিবার পণ ভঙ্গ হইবে না। কোন আর্থিক লাভ নাই—কেবল একটা জয়ের আনন্দ—ঈশ্বরত্বের আত্মতুষ্টি—এই জিগীষাকে জ্বালাইয়া রাখে। কিন্তু এই নিষ্কাম ভাব লোপ পাইয়া যাইতেছে। লালসার বহ্নিতে সমগ্র জাতিটা জ্বলিতেছে।

আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতি-জয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না ও বুঝিতে চান না।

হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্ব সম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধন। ঈশ্বর হইতে গেলে ঐশ্বর্যশালী হইতে হয়। যাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই, সে ঐশ্বর্যের অধিকারী নহে। কিন্তু যিনি স্বাধিকারের প্রাচুর্য ও বাহুল্যগুণে প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই প্রভু—তিনিই ঈশ্বর—ঐশ্বর্যের স্বামী। রাজা নিজভুজবলে মৃগয়া করিতে সমর্থ—তথাপি অস্ত্রধারী অনুচরেরা তাঁহাকে অনুসরণ করে। অনুচরের তাঁহার প্রয়োজন নাই। তাহারা কেবল বাহুল্যমাত্র। মৃগয়াপক্ষে তাহাদের থাকা না থাকা সমান কথা। রাজার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা ঐশ্বর্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে মাত্র। কিন্তু যে ভীরু বা কাপুরুষ শত বা সহস্র রক্ষী বিনা আত্মরক্ষা করিতে পারে না তাহারই অনুচরবর্গের যথার্থই প্রয়োজন আছে। অনুচরেরা তাহার যেমন দাস সেও তদ্রূপ তাহাদিগের দাস। সে প্রয়োজনের বশগামী। অনুচরবর্গ সত্ত্বেও ঈশ্বরত্ব তাহার নাই।

প্রকৃতিকে ব্যবহার-ক্ষেত্রে জয় করিয়া—তাহাকে সেবাদাসী করিয়া

J।

কি ফল যদি তাহার সঙ্গ ব্যতিরেকে শান্তিভঙ্গ হয়। এরূপ জয়—জয় নহে কিন্তু পরাজয়—কেবল দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা। আমি যদি বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া আমার দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারি কিন্তু তাহার ক্ষিপ্র সংবাদ বহন বিনা রাত্রিতে আমার নিদ্রা না হয় তাহা হইলে ধরিতে গিয়া কেবল ধরা পড়া হয় মাত্র। যদি কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া নররক্ত পাত করিয়া মরুভূমির গর্ভ হইতে স্বর্ণ আহরণ করি—আর সেই স্বর্ণ লইয়া স্বার্থের সহিত স্বার্থের ঘোর সংঘর্ষ ঘটে—সেই কাঞ্চন লইয়া মারামারি পড়িয়া যায়—সেই হেমপ্রভা বিচ্যুত হইলে আমার শয্যাকণ্টকী পীড়া হয়, তাহা হইলে পুরুষকার আর গোলামিতে কি প্রভেদ।

হিন্দুর প্রকৃতি-জয় ওরূপ নহে। প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দুস্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর নিকট তিনিই নরশ্রেষ্ঠ যিনি ভূমা অনন্ত সর্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামরূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবা করে বটে কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ সকল ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য তাঁহার নিকট কেবল বাহুল্যমাত্র। উহার থাকা না-থাকা তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মস্থিতি সেখানে অনাত্ম বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্বলাভ হিন্দুর আদর্শ।

আজ হিন্দু জাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পূর্ব সাধনার লক্ষণ এখনও বর্তমান। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে অতি অল্পই প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহার আচার-ব্যবহার

আদানপ্রদান কঠোর সংযম দ্বারা নিয়মিত। সংসারের ভোগৈশ্বর্যকে লাঞ্ছিত করিয়া যেন তাহার দৈনিক কার্যের সমাধান হয়। গৃহস্থ ছাড়িয়া নৃপতির প্রাসাদে যাও—দেখিবে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি—মণি-মুক্তা হীরা-জহরৎ শালদোশালা কিংখাবে প্রকোষ্ঠ সকল সমাকুল। সেই সকল ধনরত্নবসনভূষণ কিন্তু বাহুল্যরূপে বিরাজিত। রাজা উহাদের অধীন নহেন। সে সকল কখন ব্যবহার করেন কখন পরিহার করেন। ঐশ্বর্যের আধিক্যে প্রয়োজন কোথায় পলায়ন করিয়াছে। রাজার মহিমা-বর্ধনের জন্যই মণি-মাণিক্যাদির কেবল প্রয়োজন—অভাব পূরণের জন্য নহে। হিন্দুর হয় সম্ভোগসামগ্রীর অল্পতা—সাধাসিধে চালচলন—নয় ত ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি বাহুল্য আড়ম্বর। প্রয়োজনের সুদীর্ঘ পরম্পরার নিগড় হিন্দুকে বাঁধিয়া রাখে না।

কিন্তু য়ুরোপে ইহার বিপরীত ভাব। য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুঁটিনাটি সামগ্রীর আদি-অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন করপ্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায় পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুর-বিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রবৃত্তির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা-গণ্ডা সুদে-আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে না। প্রকৃতি যেমন ইংরেজের দাস, আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস।

ধান ভানিতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছি। ঘণ্টা দুই বেড়িয়ে আমরা শহরে ফিরে এলাম। গ্রামগুলি দেখে কেবল আমার মনে হোতে লাগিল যে এখানে একটা বাঙ্গালীর আড্ডা করিলে মন্দ হয় না। ছাত্রেরা গ্রাম থেকে অনায়াসেই উক্ষপারে পড়িতে আসিতে পারে—কেননা বড় বড় ঘোড়ার গাড়ি সদাই যাতায়াত করিতেছে।

ব্যবসায়ীরাও থাকিতে পারেন। লণ্ডন ও এখান হইতে বারমিংহাম দেড় ঘণ্টার পথ। একটি ছোট গ্রামের মতন হোলে ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়ান যায়।

সেদিন একটি ছেলে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করিতেছিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে একর্ডিয়ন বাজাইতেছিল। বোধ হোলো বৈষ্ণবের ছেলে যেন গাহিতেছে। বড় মিষ্টি স্বর। আহা—তার নাকে যদি একটি তিলক থাকিত তা হোলে সোনায় সোহাগা হোতো। এখানে শুধু ভিক্ষা করিবার যো নাই। তবে গান গেয়ে বা বাদ্য বাজিয়ে ভিক্ষা করিতে পারা যায়। একজন অন্ধ একটি ছোট মেয়ের হাত ধোরে রাস্তা দিয়ে গাহিতে গাহিতে যায়। পাড়া একবারে মাতিয়ে তুলে। ইংরেজের সুরে কেমন একটা ধুপধাপের ভাব আছে কিন্তু এর গলাটি এমনি মোলায়েম যে একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যেতে হয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার পর তৃতীয় বক্তৃতাটি অতি বিলম্বে হইয়াছিল। সভাপতি ডাঃ কেয়ার্ডের সময় ছিল না বলিয়া তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আর বক্তৃতার সময় ছিল না। কালেজ সব বন্ধ হোয়ে গেল। পাঁচ হপ্তা পরে আবার খুলিবে। তখন বক্তৃতা আরম্ভ করা যাবে। বারমিংহামে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বক্তৃতা ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইবে।

উক্সপার,
১৬ই জানুযারি

চার

সত্যি কথা বলিতে কি—বিলিতি সভ্যতার আড়ম্বর আমার একেবারে ভাল লাগে না। প্রকৃতিকে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি আমার চুচক্ষের বিষ। হোতে পারে আমার স্বভাব একঘেয়ে হোয়ে গেছে, তাই বুঝি

মধুও পান্‌সে পান্‌সে লাগে। প্রকৃতিকে একেবারেই ছুঁতে নেই, তবে না ছুঁলে চলে না—তাই বিধিনিষেধের অধীন হোয়ে ওষুধ গেলার মত স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এখানে বিধিও নাই নিষেধও নাই—রাস্তা খোলা। আর এড়াবারও জো নেই। প্রকৃতি গায়ে এসে পড়ে। সম্ভোগবহুল সভ্যতার আবর্তে এসে পড়েছি। খুব ঘুবপাক নাকানি-চোবানি খাচ্ছি। ঘুরপাকে মজা যে নাই তা বলিতে পারি না। বঙ্গবাসীর পাঠকদিগকে সেই মজাটুকু পাঠিয়ে দিতেছি।

গেল হপ্তায় লণ্ডনে গিয়েছিলাম। ইস্টিশান থেকে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যাচ্ছি, আর হঠাৎ পুলিশ এসে মাঝরাস্তায় থামিয়ে দিলে। দেখি লোকে লোকারণ্য, ব্যাপার কি—না, রাজা সেই রাস্তা দিয়ে যাবেন। আমার পাশে একজন ইংরেজ আরোহীকে বলিলাম যে আমার কপাল ভাল—আজ রাজদর্শন হবে—আমরা বিশ্বাস করি যে রাজদর্শনে পুণ্য হয়। সে বলিল, তোমাদের অদ্ভুত ভক্তি। এই রকম বলাবলি কচ্ছি আর ব্রুহামগাড়ি কোরে রাজাধিরাজ ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড পাপ-চোখের সামনে এসে উপস্থিত। গাড়ি দ্রুতবেগে চলেছে—কেবল চকিতের দেখা। কিন্তু তাতেই প্রাণমন পুলকিত হোয়ে গেল। মনে হোলো যেন শক্তিরূপিণী মহামায়া বিজলী হাসি হেসে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। মহাশক্তি হিমগিরির সিংহ ত্যাগ কোরে যেন ব্রিটিশসিংহকে বাহনরূপে বরণ করেছেন। মহেশ্বরীর মায়ার খেলা কে বুঝিতে পারে।

লণ্ডনে আমার একটি ছাত্র আছে। সে এখানে সওদাগরি করে। তার বেশ দুপয়সা রোজগারও হয়। ভারতবর্ষে বারো বৎসর পূর্বে আমার কাছে পড়ে এন্‌ট্রেন্স পাস করেছিল। সে আমায় ভারি খাতির করে। সেই ছাত্র আমাকে ভোজনাদি যথারীতি করায় এবং সকল রকমে যত্ন করে। দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটার সুবিধা থাকিলে খুব ফুর্তি হয়। তাই লণ্ডনে খুব ঘুরে বেড়িয়েছি।

লণ্ডনের ভিতর ট্রামগাড়ি নাই। বাহিরে আশে পাশে যেতে গেলে ট্রাম পাওয়া যায়। শহরের মাঝে কেবল অমনিবস্‌। ইহা এক রকম

প্রকাণ্ড গাড়ি। ভিতরে ২২ জন ও ছাদে ২৪ জন বসিতে পারে। বড় বড় তুটা ঘোড়ায় টানে। মাইল-করা এক আনা ভাড়া। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িও বিস্তর। ব্রুহামগাড়িকে আধখানা কোরে কেটে ফেললে যে রকম হয় সেইরকম ইহার আকার। তুটি লোক বসতে পারে। কোচুয়ান ছাদের পেছন দিকে কোচবাক্সে বসে ও প্রয়োজন হোলে ছাদে একটি ছিদ্র দিয়ে আরোহীর সঙ্গে কথা কয়। ফি মাইলে ৵০ আনা ভাড়া পড়ে। অধিক ।৵০ আনা করে বেশি লাগে। এখানে গাড়িওয়ালাদের সঙ্গে বকাবকি একেবারেই করিতে হয় না। রাস্তা ও বাড়ির নম্বর বোলে চক্ষু বুজে গাড়িতে উঠে পড়ো আর অনতিবিলম্বে নির্ভাবনায় গম্যস্থানে হাজির—যেন কলের খেলা। ভাড়া নিয়ে দর-দস্তুর নেই। যা নিরীখ করা আছে তাই দিতে হবে। গৃহস্থ ও সাধারণ লোকে অমনিবসেই চড়ে আর শৌখীন লোকে ভাড়াটে গাড়ি চড়ে। এই অশ্বযান ছাড়া তিন রকম বাষ্পযান আছে। এক সোজাসুজি রেলগাড়ি, আর-এক নীচভূঁই রেল, আর তৃতীয় পাতাল গাড়ি। নীচভূঁই রেল বড় কিছু আশ্চর্য কারখানা নয়। রাস্তার দশ-বিশ হাত নীচে দিয়ে গাড়ি চলে। মাঝে মাঝে টনেল সুড়ঙ্গ আছে, কিন্তু প্রায়ই মাথার দিক খোলা। রাস্তার লোক সাঁকো বা পুলের উপর দিয়ে সেই সব রেলরাস্তা পার হয়। কিন্তু আজব কারখানা সেই পাতাল গাড়ি। এ নামটি আমি রেখেছি। ইংরেজিতে টিউব অর্থাৎ সুড়ঙ্গ রেল বলে। এই পাতাল রেল আন্দাজ ১২ মাইল লম্বা হবে। জমির ৬০ হাত নীচে এক সুড়ঙ্গ কাটা আছে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে রেলগাড়ি যাতায়াত করে। মাইলে মাইলে ইস্টিশান। তু-আনা ভাড়া—তা এক মাইলই হোক আর দশ মাইলই হোক। ধনী-দরিদ্র বড়-ছোট সব এক শ্রেণী। টিকিট কিনে একটি কাচের বাক্সে ফেলে দিতে হয়। আর একটি লোহার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তারপর একজন কর্মচারী এসে কি একটা কল টেপে, আর অমনি সুড় সুড় কোরে লোহার ঘরটি নীচে নামে। প্রায় পঞ্চাশ ৫০ হাত নীচে গিয়ে

সেই ঘরটি আটকে যায়। তার পর পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাকি ১০ হাত নেবে প্লাটফরম পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলোয় একেবারে কুরথুট্টি। সুড়ঙ্গের এক মুখ থেকে ক্রমাগত কলের দ্বারা হাওয়া চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাই হাঁপ ধরে না। কিন্তু হাওয়াটা যেন একটু ঘন-ঘন বোধ হয়। দু মিনিট তিন মিনিট অন্তর গাড়ি। গাড়িও একেবারে আলোয় ভরা। গাড়ি থেকে নেমে আবার লোহার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই সুড়সুড় কোরে উপরে উঠা যায়। ইহাকেই বলে পাতাল গাড়ি। এটা একটা সভ্যতার বাহাদুরি বা ডানপিটেগিরি। পাতাল দিয়ে রেল চালানো কিছু আবশ্যক ছিল না। এজন্য এখানকার লোকে বড় জ্বালাতন হয়েছে। যাদের বাড়ির নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ গেছে তারা রাত্রিতে এক রকম গম্‌গমানি শব্দ শুনিতে পায়—ঘরদোর যেন টল্‌ছে—এইরকম তাদের বোধ হয়। আর যারা সুড়ঙ্গে কাজ করে তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কখন কখন কোন কোন বাড়ি ধ্বসে যায় আর রেল-কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ সহিতে হয়। ৬০ হাত নীচে সুড়ঙ্গ কেটে গাড়ি চালান একটা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে বটে। তবে শেষ রক্ষা হোলেই ভাল। প্রকৃতি সভ্যতার এত অত্যাচার সহ্য করিতে না পেরে শেষে না প্রতিশোধ লয়।

লণ্ডনে আমার চোখে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস একটি হাইড পার্ক—প্রকাণ্ড বাগান। কলিকাতার বিডনস্ট্রীট সারকুলার রোড হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোড দিয়ে যতখানি জায়গা ঘেরা যায় হাইড্ পার্ক ততটা হবে—বেশী ত কম নয়। ইহা বৃক্ষলতাপুষ্পে সুশোভিত ও বড় বড় তৃণাচ্ছাদিত মাঠপূর্ণ—দেখিলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ আছে। তাহাতে মরালাদি জলচর পক্ষী সকল ক্রীড়া করে। মাঝে মাঝে আবার মনোহর দ্বীপ। সন্ধ্যার সময় যখন সমস্ত পার্কটা ইলেক্‌ট্রিক আলোকমালায় ভূষিত হয় তখন মনে হয় যেন অমরাবতী ধরাধামে অবতীর্ণা। ইহা প্রণয়িজনের বিহারবন—ভাবুকের চিন্তাভবন—অলসের আরাম—গলাবাজি বক্তৃতার রঙ্গভূমি—

চোরছেঁচড়ের আশ্রয়—কর্মক্লিষ্ট কেরানীর প্রাণ। মনে হয়, লোক-ভারাক্রান্ত লণ্ডন যেন এই স্থান দিয়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে।

লণ্ডনে চুরি-জুয়াচুরি-খুন লেগেই আছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক। পৃথিবীর সবজাতি এখানে বর্তমান। তাই সবরকম দুষ্কর্মও মূর্তিমান্। সেদিন একটা বড় মজার চুরি হয়ে গেছে। বড় রাস্তার ধারে এক জহুরীর দোকান। বহুমূল্য আংটি সকল কাচের জানালার ভিতর সাজান রয়েছে। হাজার হাজার লোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে আর একটা লোক একখানা পাথর নিয়ে ধাঁ করে জানালায় মার্লে। আংটি সব ছড়িয়ে পড়িল। টপাটপ্ সব কুড়িয়ে নিলে। জুয়াচোরের দলেরা সেইখানে ভিড় কোরে দাঁড়িয়েছিল। তারা কতকগুলা কুড়িয়ে দোকানদারকে দিলে কিন্তু অধিকাংশ পাচার কোরে ফেলল। যে লোকটা পাথর মেরেছিল সে হৈ হৈ কোরে সরে পালাবার যোগাড় করেছিল কিন্তু পুলিশ ভারি জবর—পাকড়াও করে ফেললে। চোর কিছু দুঃখিত নয়। ছমাস বা এক-বৎসর জেল খেটে এসে সে কিছু মেরে দেবে। এক একটা আংটি ১০০০৲ বা ১৫০০৲ টাকা দামের। জহুরী বেচারি একেবারে অবাক্। দিন-দুপুরে সদর রাস্তায় চুরি।

আমি একজন বন্ধুর বাড়িতে দিন কয়েকের জন্য অতিথি হোয়ে রয়েছি। সেদিন গৃহিণীর বোন্‌ঝি ও তার সুইটহার্ট মিষ্টপ্রাণ অর্থাৎ প্রণয়ী এসেছিল। তারা দুদিন ছিল। এরা ভদ্র গৃহস্থ। প্রণয়ী বছর পঁচিশের হবে ও প্রণয়িনী বছর কুড়ি। আমি এদের গল্পচ্ছলে আমাদের দেশে স্বামী ও স্ত্রী কিরূপ ব্যবহার করে এবং পরস্পরের ভালবাসা কেমন আড়ালে লুকিয়ে রাখে—তাই বর্ণনা করেছিলাম। কুড়ি বছরের সেই যুবতী আমায় বলল যে, বোধ হয় আমাদের এই প্রণয়ব্যবহার তোমার ভাল লাগে না। বিবাহ-বদ্ধ না হইলেও তারা দুজনে সদাই মুখোমুখি কোরে বোসে থাকে আর পরস্পরকে আদর করে। মেসো

মহাশয় ঠাট্টা করে বললেন যে—ও প্রণয় ছুদিনের—বিয়ের পর সব জুড়িয়ে যাবে। এ ঠাট্টা যুবতীর সইল না। তাই মেসো মহাশয় আরো চেপে ধরলেন ও বললেন—মনে নেই—তোমার মাসীর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে তুমি আমার সুইটহার্ট ছিলে। বোন্‌ঝি গ্রাবা বাঁকিয়ে বলিল যে ওরকম সুইটহার্ট আমার ঢের ছিল। কত যুবক আমার প্রণয়ের ভিখারী হয়েছিল।

মেসো মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন—তিনি জবাব দিলেন—হ্যারি পার্কিন্‌স্‌কে মনে আছে? হাঁ, আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বটে কিন্তু আমার এই বর্তমান সুইটহার্ট আমার ঠিক মনের মত হোয়েছে। সুইটহার্ট বেচারি বড় কথা-টথা কয় না। তিনি প্রণয়িনীর জুতা বুরুশ করিয়া দেন—কাপড়-টাপড় ঝেড়ে দেন আর কেবল এক দৃষ্টিতে সেই প্রণয়িনীর রূপমধু পান করেন। আর এদিকে প্রণয়িনীর মুখে খই ফোটে। আমার গল্প তার বড় ভাল লেগেছিল। অনেকক্ষণ ধোরে আমার কাছে তারা বসে থাকত ও গল্প শুনত। আমিও মিষ্টি মিষ্টি কোরে মধুরে কেমন কোরে মঙ্গলভাব মিশাতে হয় তা আমাদের হিন্দু আচার-ব্যবহারের গল্প কোরে বলেছিলাম। অক্ষফোর্ডে এক স্ত্রীলোকদের সভা আছে। আমাকে সেই সভায় হিন্দুগৃহস্থালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়েছিল। এক অধ্যাপকের ঘরণী ভারি বিদুষী—সভাপতি (পত্নী) ছিলেন। মেয়ের পাল সভায় উপস্থিত আর দু-দশজন পুরুষও ছিল। আমাদের ছোট মেয়েরা কি রকম পুণ্যপুকুরে যমপুকুরের ব্রত করে—গোলাপ টগর পাতায়—বলেছিলাম। হিন্দু-বিবাহের বিবরণ শুনে তারা ভারি খুশি। ঢেলাভাঙ্গানি শয্যাতোলানী বাসর-ঘর ইত্যাদিও বলতে হয়েছিল। ছাঁদনাতলায় বর কানমলা ও কীল খায় শুনে রমণীদের কেবল হো হো হাসি। ঘাটে নাইতে গিয়ে মেয়েরা কি রকম কমিটি করে—শাশুড়ী কেমন কনে-বউকে শায়েস্তা করে, স্বামী-স্ত্রী অন্যের সামনে বিশেষ গুরুজনের সমক্ষে দেখাদেখি বা কথা কইতে পারে না—আমরা ভালবেসে বিয়ে করিনে, বিয়ে করে

ভালবাসি—এসব কথা বর্ণনা করেছিলাম। শেষ কথা যে, আমরা তোমাদের মতন কেবল জুতার ফিতা বেঁধে দিয়ে বা জুতা বুরুশ করে স্ত্রীলোকের সম্মান করি না। কিন্তু আসলে করি। আমার ভ্রাতৃবধূ যদি বিধবা হয় তাহলে সেই বিধবা ও তাহার পুত্রকন্যাকে আমার ভরণপোষণ করিতে হয়। সেইরূপ বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে আহার বসন যোগাইতে হয়। স্ত্রীলোক আমাদের নিকট অবশ্য প্রতিপাল্য। আমরা আমাদের স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার করি—এরূপ নিন্দা তোমরা বিশ্বাস করিও না। বক্তৃতার শেষে বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা এসে আমায় বললেন যে, পাদরি ও জানানা-লেডিদের মুখে ভারতের নিন্দার কথা আমরা অগ্রাহ্য করিব। একজন সাহেব বললেন যে, এই রকম বক্তৃতা বিলাতের শহরে শহরে হওয়া উচিত।

ভারতের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয় তাহাই একান্ত বাঞ্ছা।

অক্ষফোর্ড, ৬ই মার্চ ১৯০৩ বি. উপাধ্যায়

পাঁচ

বসন্তের সমাগম হয়েছে। শীতের প্রকোপ আর নাই। প্রকৃতি আবার নবজীবন পেয়েছে। ছ মাস ধোরে গাছগুলিতে একটিও পাতা ছিল না। উলঙ্গ উর্ধ্ব-বাহুর মত দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কে যেন নব কিশলয়-বসন পরিয়ে দিয়েছে। আর অনেক গাছে কেবল ফুল—পাতা এখনও দেখা দেয় নাই। এই ফুলের হাসি দেখে কালিদাসের কথা মনে পড়ছে।—

কুসুমজন্ম তাতোনবপল্লবা
স্তদনু ষট্পদকোকিলকূজিতম্।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্মধু
দ্রুমবতীমবতীর্য বনস্থলীম্॥

প্রথমে কুসুম-জন্ম, তারপর নবপল্লব, তারপর ভ্রমর ও কোকিলের কূজন। এইরূপে বসন্ত আবির্ভূত হয়। বিলেতেও সেই কালিদাসের বসন্ত। এখানে পাখীর ডাক এত মিষ্টি লাগে যে মনে হয় যেন কানে মধু ঢেলে দিচ্ছে। কার্তিক মাস থেকে প্রায় চৈত্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত কিছু সাড়া শব্দ নাই, তার পরে একেবারে ঝঙ্কারে চারিদিক পরিপূরিত—তাই বুঝি প্রাণটা এত কেড়ে নেয়। এমন তরু নাই যাতে বিহগ নাই, এমন বিহগ নাই—যে কলধ্বনি করে না। এমন কলধ্বনি নাই—যাহা মুগ্ধ করে না। কি কপচান কি পিস—বিরহীর বাঁচা দায়। তবে আমার ভাগ্যগুণে বিরহ-জ্বালা নাই তাই এখনও বেঁচে আছি। মাঠে-ঘাটে এত ফুল যে দেশটা এক প্রকাণ্ড মালঞ্চের আকার ধরেছে। দফাদিল Daffodil) কুসুমে মাঠ সব একেবারে বিছিয়ে গেছে। সত্যি সত্যিই দফাদিল—দিল অর্থাৎ মনের দফা রফা। আর করকাশ (Crocus) ফুলের রঙ-বেরঙের ঘটা দেখলে চোখ ফেরান দায়। প্রেমরোষগুলি (Primrose) বাস্তবিক যেন এক একটি অভিমানিনী—রোষভরে চেয়ে রয়েছে। যশোমণি (Jessomini) ও বোলাটের (Violet) কথা আর কি বলবো—যে দেখেছে সে মজেছে।

এখানে ছেলে বুড়ো সব একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। মুখে হাসি আর ধরে না। সূর্যদেবের অনুগ্রহ খুব হয়েছে। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত চৌদ্দ ঘণ্টাকাল আকাশে অবস্থিতি করেন আর দুঘণ্টা গোধূলি। ষোল ঘণ্টা দিনমান। কিন্তু পৌষ মাসে ছঘণ্টা দিন আর তাও সূর্যদেব প্রায় মেঘে বাদলায় ঢাকা থাকেন। বেলা ছটার সময় রৌদ্রে দিগ্‌দিগন্ত ফেটে পড়ছে কিন্তু রাস্তায় জনমনুষ্য নাই। সকলের জানালা দরজা বন্ধ। পড়ে ঘুমুচ্ছে। এখানে ঘড়ি ধোরে কাজ চলে—বেলা দেখে নয়। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে খাওয়া শোয়া কাজ-কর্মের সব এক সময়।

অন্ধকারের পর এত আলো তাই লোকের খুব আনন্দ। এরা

প্রকৃতির সৌন্দর্যে এত মজে যায় যে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণও বোধ হয় লুচিমণ্ডা পেয়ে এমন আত্মহারা হয় না। ফুলভরা মাঠে বালক-বালিকা যুবক-যুবতী সত্যি সত্যি গড়াগড়ি দেয়।

আমি এখানে একটি বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, ইংরেজের নিকট প্রকৃতি—সম্ভোগের বস্তু বলিয়াই আদৃত হয়, তাই তাদের পক্ষে রূপের পূজা বা প্রতীক বা উপাসনা অসম্ভব। হিন্দু-সন্তান কি প্রকার রূপের পূজা করে স্বরূপলাভের জন্য তাহা শুনে ভাল ভাল লোকেরা বলেছিল যে রূপের পূজাকে আর কখনও নিন্দা করিবে না।

রূপের দুইটি ভাব—মধুর ও মঙ্গল। মাধুর্য ও কল্যাণের সমাবেশ স্বরূপের ভূমানন্দ। কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়া মধুরকে মঙ্গলভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও ব্যবহার করি। যাহার আকর্ষণে মাদকতা জন্মে, ইন্দ্রিয় বিলোড়িত হয়—তাহাই মাধুর্য। সম্ভোগের আবর্তে মাধুর্যই জীবকে টানিয়া আনে। মঙ্গল কিংস্বরূপ। আত্মদানই মঙ্গল। পূর্ণতা যখন উপচিত হইয়া অপরকে ভরপুর করে, বাসনাকে সমাহিত করে, সম্ভোগের প্রমোদকে বিশুদ্ধানন্দে পরিণত করে, তখনই শিব-স্বরূপের দর্শন হয়। সালঙ্কারা নবপরিণীতা বধূর চপলমাধুরী মুগ্ধ করে, প্রিয়জনকে অপর আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু ভূষণ-বিরহিতা আলুলায়িতকেশা কল্যাণময়ী মাতা দান করিতেই ব্যস্ত—আত্মদান ভিন্ন অন্য কোন কার্য নাই। অল্পজলা স্রোতস্বতী কলকলরবে নাচিতে নাচিতে ধাবিত হয়—মধুরতা যেন দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত। আর তুষারপরিপুষ্টা আপূর্যমাণা ভাগীরথী আত্মসলিলদানে কত শত প্রবাহকে পূর্ণ করিয়া মাতৃপদে বরণীয়া হইয়াছেন। অনেক ফল ফুল তরুলতা আছে বটে, কিন্তু কদলীবৃক্ষ মঙ্গলের পরিচায়ক। কোন অনুষ্ঠানে স্নেহরূপা রম্ভা-তরুর অভাবে—তথায় শতসহস্র নবমল্লিকার সদ্ভাব থাকিলেও—মঙ্গলের যেন অধিষ্ঠান হয় না। কেন—কদলীবৃক্ষের ন্যায় আত্মদ আর কে আছে? পর্ণ—ভোজনপাত্র। সার—আহার সামগ্রী। শঙ্ক—রজকের

ব্যবহার্য। আর প্রাণবিসর্জন-সমন্বিত ফলদান দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

যতদিন প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবে ততদিন রূপের সাধন করিতেই হইবে। অনিত্য রূপকে নিত্যস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ না করিলে প্রবৃত্তি-পরায়ণ মানবের পক্ষে স্বরূপলাভ অসম্ভব। মাধুর্যশালী বস্তু প্রতীক হইতে পারে না কেননা তাহা প্রবৃত্তিকে সম্ভোগমুখিনী করে। যাহা মহান্ মঙ্গলময়, যাহা আত্মদান করে, তাহাই সেই শিবস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া স্বীকৃত। গীতাশাস্ত্রে জ্যোতিষ্কের মধ্যে তপন, পাদপের মধ্যে অশ্বত্থ, গিরির মধ্যে হিমালয়, নদীর মধ্যে গঙ্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ—ইত্যাদি বিভূতিমান্ কল্যাণময় বস্তুই প্রতীক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। যখন কোন ভক্ত অশ্বত্থের মূলে জলসেক করে তখন ভূমার মঙ্গলভাবই পূত হয়। যখন কুলকামিনীরা পয়স্বিনী গাভীর পরিচর্যা করে, ভালে সিন্দূর লেপন করিয়া তাহাকে মাতৃপদে বরণ করে, তখন অনন্ত করুণাই উপাসিত হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা সূর্যদেবকে বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করেন তখন হিরণ্ময় পুরুষই স্তুত হন। অবিশেষকে জানিতে গেলে—বিশেষ বস্তু, বিশেষ স্থান, বিশেষ কালকে তাঁহার বিশেষ অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গঙ্গোত্রী পবিত্র তীর্থ, সাধারণ গ্রামে বা নগরে সে পবিত্রতা নাই। গ্রহণের কাল—অন্যান্য কালের অপেক্ষা দান-পূজার অধিকতর উপযোগী। সাধুভক্তগণের আবির্ভাব বা তিরোভাবের তিথি অপরাপর তিথি অপেক্ষা নিশ্চয়ই সম্মানার্হ। অশ্বত্থ অন্য বিটপীর অপেক্ষা পূজ্যতর। গঙ্গা মাতৃস্থানীয়া, যে-সে নদী নহে। রূপকে এই প্রকার স্বরূপের বিগ্রহ বলিয়া উপাসনা করিতে হয়। রূপকে সাধন-সামগ্রী না করিলে প্রবৃত্তির তাড়না হইতে বাঁচা দায়।

ইংরেজেরা প্রকৃতির রূপকে ভালবাসে, কিন্তু রূপের সাধন জানে না। নব্য সভ্যতার শাস্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে পবিত্রতার বা মঙ্গলভাবের আরোপ নাই। প্রকৃতির মাধুরী লইয়া কত না গীত—কত না গাথা! কিন্তু যে সকল

বস্তু আস্বাদ ও কল্যাণময় তাহার আদর নাই। ক্রোটন আর অর্কেরিয়া লইয়াই ব্যস্ত। অশ্বত্থ বা কদলী বা বিল্বতরুর কোন সম্মান নাই। প্রকৃতি কেবল সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে। তাহার মঙ্গলময় রূপ তিরস্কৃত হইয়াছে। আর এদেশে সম্ভোগের ভাব অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে মঙ্গলভাব দেখা সুকঠিন ব্যাপার। ছয়-সাত মাস স্বভাব যেন একেবারে মৃতপ্রায়। তার পরে সৌন্দর্যে ফেটে পড়ে। এতদিন সংযমের পর যদি গোটাকতক দিন আমোদের সময় মাধুর্য সম্ভোগ না করা যায় তাহলে জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিবে।

আমার রূপের পূজার ব্যাখ্যা শুনিয়া এক মস্ত অধ্যাপক-পাদরি আমায় লিখিয়াছেন যে রূপসাধনের তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও মনোহর। এরা অনেকে মনে করেন যে, যদি ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে এই হিন্দুভাব নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জগতের ঘোর অনিষ্ট হইবে।

হিন্দুব বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করি। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, বর্ণধর্মই হিন্দু জাতিকে চিরজীবী করিয়াছে। কত জাতি লোপ পাইয়াছে কিন্তু হিন্দু এখনও বর্তমান। হিন্দু যেরূপ ঝড় তুফান বিপ্লব সহিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত আর ইতিহাসে নাই। ইংরেজের একতা রাজনীতির উপর নির্ভর করে। আমি এদের বলিয়াছি যে, আগে দেখাও যে রাজনৈতিক একতা এত ঝড় তুফান সহিতে পারে, তবে আমাদের শিক্ষকতা করিতে আসিও। মিছামিছি বর্ণধর্মের নিন্দা করিও না।

আর বক্তৃতার ফল এই হয়েছে যে, জন কয়েক অধ্যাপক এক কমিটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—যাহাতে অক্ষফোর্ডে হিন্দু দর্শনের শিক্ষা হয়। এই সদুদ্দেশ্যের সফলতা অর্থের উপর নির্ভর করে। তাই বিধাতার মুখপানে চেয়ে চুপ করে আছি।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার হাবভাব যত বুঝিতেছি তত আমাদের দেশে সংস্কারকদের উপর আমার রাগ বাড়িতেছে। সভ্যতার যে ভাল দিক আছে তাহা ঢের বুঝান হইয়াছে। তবে আমরা গুণই জেনেছি,

গুণাগুণ ভাল করে বুঝিনি। শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে, এখানে শতকরা চল্লিশ জন বিবাহ করিতে পারে না। গরীব ভদ্রগৃহস্থের বিবাহ করা দায়। যদি তাহারা সমান ঘরে বিবাহ করে তাহলে সমাজে গৃহিণীর মর্যাদা রাখিতে গিয়া গাউনের খরচাতেই প্রাণ অন্ত— একেবারে ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন। আর যদি নীচু ঘরে বিবাহ করে তাহলে একঘরে হতে হয় - নিজের সমাজে নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হয়। এই সভ্যতার তত্ত্বটি আমি অতি অন্তরঙ্গ ভাবে জানিয়াছি, বাহির থেকে বড় একটা জানা যায় না। অর্থাভাবে প্রজাপতির নির্বন্ধ রহিত হয়ে প্রবৃত্তির যদৃচ্ছাচারিতা ক্রমশই বাড়িতেছে।

এখানে বিপুল ঐশ্বর্য কিন্তু দরিদ্রতাও খুব। শতকরা ত্রিশ জন দরিদ্র অর্থাৎ কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করে। তার মধ্যেও আবার অনেকে তাও পারে না।

শুনলে বিশ্বাস হয় না যে, এখানকার অধিকাংশ শ্রমজীবীরা মাংস খেতে পায় না। মদিরাটুকু (Beer) চাইই-চাই কিন্তু মাংস কিনিবার পয়সা তাদের জুটে না। কেবল রবিবার দিন মাংস খায়—আর অন্য দিন রুটি পনীর আলু ইত্যাদি খায়। একদিকে যেমন অর্থ বাড়িতেছে, অপর দিকে তেমনি অভাব বাড়িতেছে। প্রতিযোগিতা যে সভ্যতার মূল, তাহার ফল এইরূপ হইবেই হইবে। এখানে কলেতে (factory) অপরিণীতা স্ত্রীলোক সকল কাজ করে। তারা যে রোজগার করে তাতে তাদের কিছুতেই চলে না। তাই তারা প্রায় সকলে পেটের দায়ে দুশ্চরিত্রা হয় এ একেবারে জানা কথা। তবুও এমনি প্রতিযোগিতার (Competition) চাপ যে তাদের পাওনা বাড়ান বড়ই মুশকিল।

অর্থ যে কি অনর্থ ঘটিয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না। যদি বড় মানুষ হয় তাহলে তার ছেলেমেয়ের বিবাহোপলক্ষে খানা ও মজলিসে গরীব পিতামাতার ভাইভগ্নীর নিমন্ত্রণ হবার জো নাই। ভ্রাতৃ-ভাবাপন্ন সংস্কারকেরা এই সভ্যতার ফলটি একটু তলিয়ে যেন দেখেন। তাহোলে তাঁদের জাতিভেদের উপর বিদ্বেষ ঘুচে যেতে পারে।

আর একটা কথা বলি। স্বাধীন প্রেমে বড় একটা বিভ্রাট ঘটেছে পণ-ভঙ্গের (Breach of Promise) মকদ্দমার কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। কোন যুবক যদি কোন যুবতীকে বাগ্‌দান কোরে বিবাহ না করে তা হোলে খেসারত নালিশ চলে। এই রকম নালিশ অনেক হচ্ছে বোলে হাকিমেরা দণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেদিন এক গরীব যুবকের পণভঙ্গের দরুন ৭৫০০৲ টাকা দণ্ড হয়েছে অর্থাৎ যুবতী এই টাকাটা যতদিনে পারে কিস্তিবন্দি কোরে আদায় করে নিতে পারবে। কিস্তিবন্দিটা অবশ্য আয় অনুসারে হবে। যুবতীরা যত প্রেমপত্র—সব নম্বর ডকেট (docket) ও ফাইল কোরে রাখতে আরম্ভ করেছে—কি জানি যদি প্রণয়ীর নামে নালিশ করতে হয়। তারাও গ্রিমেণ্ট (Agreement) লিখিয়ে নিতে আরম্ভ করেছে। সেদিন কোর্টে পণ-ভঙ্গের মকদ্দমায় এক গ্রিমেণ্ট দাখিল হয়েছিল। তার মর্ম এইরূপ—আমার প্রণয়ী (ভাবী স্বামী) আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে—তা আমি জানি কিন্তু যদি কোন আকস্মিক কারণে আমায় বিবাহ না করে তাহলে আমি ১৫০৲ টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব আর সব প্রেমপত্র (Love-letters) ফিরাইয়া দিব। এই গ্রিমেণ্টের জোরে যুবক ১৫০৲ টাকাতেই রেহাই পেয়েছিল। প্রেমেও ব্যবসাদারি—বাহবা সভ্যতা।

ডাকের আর সময় নাই—আজ এই পর্যন্ত।

অক্ষফোর্ড, বি. উপাধ্যায়

২৪শে এপ্রিল, ১৯০৩

ছয়

এখানে এখন রাত নয়টা পর্যন্ত গোধূলি থাকে। আবার ওদিকে রাত তিনটের সময় বেশ ফরসা হয়। ঠিক ধরতে গেলে ঘণ্টা চারি-পাঁচ রাত থাকে। সূর্যের কিরণকে রৌদ্র বলে—কিন্তু এখানে একেবারে রুদ্রভাব নেই। দা-কাটা কড়া তামাকে আর বাবু মহলের ভ্যালসায় যত তফাৎ আমাদের দেশের এবং এখানকার রোদে তত তফাৎ। তবে বেলা দুটা-তিনটার সময় একটু মিঠেকড়া রকম হয়। সেই সময় গাছের তলায় বড় আরাম। হাওয়া যে কত মিষ্টি লাগে তা বলে উঠা দায়। এখানে গ্রীষ্মে হাওয়া খাওয়া আর মধু খাওয়া দুই-ই এক।

কালেজের ছাত্রদের খুব নৌকা-বহার ধুম পড়ে গেছে। অধ্যাপকদের কন্যারা এবং শহরবাসী গৃহস্থের মেয়েরা সব অপরাহ্নে নদীর ধারে বেড়াতে আসে। যুবক ছাত্রেরা এবং ঐ যুবতীরা নৌকা-রোহণ কোরে কখন বা ধীরি ধীরি কখন বা দ্রুতগতি দূরে দূরে ভেসে চলে যায়। কেহ কেহ আবার কোন তীর তরুচ্ছায়ায় তরীটিকে বেঁধে অলসতার মাধুর্য সম্ভোগ করে। তবে একটা কড়া নিয়ম আছে। ছাত্রেরা বড় ঘরের বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে কিন্তু যে মেয়েরা দোকানে কাজ করে নীচ ঘরে—তাদের সঙ্গে রাস্তায় কথাটি পর্যন্ত কহিলে ছাত্রটি শাস্তি পায়। সন্ধ্যার পর ছয় সাত জন দারোগা (Proctor) ঘুরে বেড়ান। এক-একজন দারোগার সঙ্গে দুজন কোরে যণ্ডামার্ক লোক থাকে। তাদের ছেলেরা নাম রেখেছে ডালকুত্তো (Bull-dog)। যদি কোন ছেলে ঐ রকম নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে কথা কয় বা বেড়াতে যায়, তা হোলে দারোগা তার নাম ও কোন্ কালেজের ছাত্র তা লিখে নেয়। অনেক ছেলে পালাতে চেষ্টা করে ও অলিগলি ঘেঁষে দৌড় দেয়। ডালকুত্তোরা অমনি পেছু পেছু ছোটে ও গ্রেপ্তার করে আনে। দারোগা রিপোর্ট কোরলে

ছেলেদের খুব সাজা হয়। তবে ছেলেরা খুব তৈয়ের। দারোগাকে ফাঁকি দিতে বেশ জানে।

আমার নিজের কথা বড় একটা বঙ্গবাসীতে লিখিনি। লিখিলেই মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এখানে কতকগুলা ভূতুড়ে বা ভূতের গল্প-প্রিয় লোক আছে। তারা মনে করে যে, হিন্দু হোলে পরের মন জানতে পারা যায়, দেওযালের ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, প্রেতসিদ্ধ হওয়া যায়। জাত ইংরেজ কি না তাই কেবল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দিকে নজর—ভক্তি বা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হবে এ সব কথা মাথায় যায় না। এরা আমায় পাকড়াও করেছিল। বক্তৃতার উপর বক্তৃতা। ভারি হৈ চৈ পোড়ে গিয়েছিল। যদি কাগজে সে সব লিখি বা লেখাই তা হোলে ধারণা হবে যে কি একটা ব্যাপার হয়েছে। কিন্তু সত্যের অপলাপ একটুও হবে না—যদি বলা যায় যে এরা অতি অকর্মণ্য লোক। আবার এদের মধ্যে মেয়েমানুষই ঢের। ভারতের যে কি দুর্দশা তা বলা যায় না। যত মেয়ে তেড়ে ফুড়ে ভারতের দর্শনতত্ত্ব শিখতে আসে। শুধু শিখতে আসে তা নয়, আচার্য হোতে চায়। এই সব মেয়েরা আমায় ধরেছিল। লণ্ডনে এক মস্ত শৌখীন লোকদের আড্ডায় (Sesame club) আমায় নিয়ে গিয়ে খানা দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি যে শৌখীন মেয়েরা সন্ধ্যাবেলার পোশাক পোরে এসেছে। সন্ধ্যার পোশাক মানে—অর্ধেক বুক ও হাত খোলা। আমার ত দেখেই আক্কেল গুড়ুম। কোন রকমে কপি ও আলু-সিদ্ধ (বিলাতে আমার ঐ ভরসা) খেয়ে চম্পট দিলাম। মিস্টর স্টর্ডি বোলে একজন আছেন তিনি খুব হিন্দুস্থান ভক্ত। তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে হিন্দুর দর্শনজ্ঞান চলে কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছেন। তিনিও বলেন কতকগুলি মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ বড় মনোযোগ দেয় না। তিনি তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন।

কিসে এখানকার বিদ্বানেরা বেদান্ত দর্শনের আস্বাদন পায় তার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত। অক্ষফোর্ড ও কেমব্রিজ

সরস্বতীর দুটি পাশ্চাত্ত্য পীঠস্থান। কিন্তু এখানকার কোন দার্শনিক অধ্যাপক হিন্দুদর্শনের বিষয় কিছুই জানেন না। যা বা জানেন তা সব বিপরীত। ডাক্তার কেয়ার্ড প্রভৃতি দার্শনিকেরা তাঁদের গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন যে বেদান্ত এক পুরানো কালের দর্শন—এখনকার বিদ্যার কাছে তাহা আর খাটে না। এ সব দার্শনিকদের কাছে মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিৎ দাঁড়াইতে পারেন না। এদের কথা সকলেই গ্রাহ্য করে। অক্সফোর্ডে আমি অল্পস্বল্প চেষ্টা করেছি, তাহার আভাস আগেই দিয়েছি। অল্পদিন হোল কেমব্রিজে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ত্রিনীতি কালেজে তিনটি বক্তৃতা করি। বিষয়—(১) হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম, (২) হিন্দুব ধর্মনীতি, (৩) হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Dr. Metaggarp সভাপতি ছিলেন। নিজের সুখ্যাতি করতে নেই, বক্তৃতা তিনটি খুব জমেছিল। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিল। বক্তৃতার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, অধ্যাপকেরা পরামর্শ করছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া যাবে কিনা। যদি সুপরামর্শ হয় তা হোলেই মঙ্গল, নইলে আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। এক দিনের কর্ম নয়, এক জনেরও কর্ম নয়। ইংরেজের ছেলেরা বেদান্ত পড়লে য়ুরোপেরও মঙ্গল ও ভারতের মঙ্গল। এরাঁই ত গিয়ে আমাদের অধ্যাপক ও হাকিম হন।

বক্তৃতা দিয়ে খুব নিমন্ত্রণ খাওয়া গিয়েছিল। একজনেরা আমায় বেশ কোরে ফলাহার করিয়ে ১০৫৲ টাকা দক্ষিণা দিয়েছে। আমি একেবারে অবাক্। এখানের দস্তুর বক্তৃতার জন্যে টিকিট করা। কিন্তু আমি টিকিট করি নে, কেননা তত্ত্বজ্ঞান বিক্রি করতে রুচি হয় না। তাই বড় খরচের টানাটানি হয়। কাপড়-চোপড়ও ছিঁড়ে গিয়েছিল—নূতন করতে গেলে অনেক খরচ। একটা লম্বা গরম জামা করতে ৪০৲ টাকার কম হয় না। ভগবান্ জুটিয়ে দিলেন। এখন একটু আরাম করে বেড়াতে পারবো।

কেমব্রিজে ষাট-সত্তর জন ভারতীয় ছাত্র আছে, তার মধ্যে বাঙ্গালী

জন দশেক। আমারও দুটি ছাত্র এখানে পড়ে। একজন নিজে হাতে পায়স ও মোহনভোগ তৈয়ারী করে খাইয়েছিল। অতি উপাদেয়। বিলেতে বসে পায়স ও মোহনভোগ খাওয়া রাজার কপালেও ঘটে ওঠে না। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাদের মেম-রাঁধুনীকে বাঙ্গালা তরকারি করতে শিখিয়েছে। ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে ধড়ে প্রাণ এসেছে। আর একজন হিন্দুস্থানী ছাত্র দেশ থেকে আমের আচার এনেছিল, তাই খেয়ে জিভটার সাড় হয়েছে। বোধ হয় আচারের জোরেই বক্তৃতাগুলো ভাল হয়েছিল।

কতকগুলি পাদরি আমাদের দেশের ভয়ানক শত্রু। তারা ছুটি নিয়ে আসে আর এখানে এসে আমাদের নিন্দা করে। এক ভয়ানক নিন্দা যে, আমরা আমাদের স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করি। কেমব্রিজে একজন পাদরি ঐ রকম খুব কুৎসা কোরেছে। দেশী-ছাত্রেরা লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূত হয়েছিল। তারা ছাত্র, তাদের কথা বড় কেহ শোনে না। আমি আসাতে সেখানকার মেয়েরা আমাকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়েছিল। তাদের বড় জানতে ইচ্ছে আমরা স্ত্রীলোকদের প্রতি কিরূপ আচরণ করি। অনেক কথা তাদের বলেছিলাম। দুই একটা বিষয় লিখছি।

আমি তাদের বলেছিলাম যে, তোমাদের পুরুষেরা কেবল তোমাদের জুতো ঝেড়ে দিয়ে সম্মান করে কিন্তু কাজের বেলা সব ফাঁকি। আর আমরা স্ত্রীলোকদের জুতা সাফ করিনে বটে কিন্তু যথাসাধ্য ভরণপোষণ কোরে সম্মান করি। আমার বিধবা ভ্রাতৃজায়া বা ভগিনী ও তাদের পুত্রকন্যাদিগকে যদি আমি প্রতিপালন না করি তা হোলে আমি সমাজে একজন অতি অধম লোক বোলে গণিত হব। বিবাহকালে কন্যার পিতা কিছু-না-কিছু অলঙ্কার বা অর্থ দিতে বাধ্য। সেই অলঙ্কার স্ত্রীধনরূপে গ্রাহ্য। তাহাতে স্বামীর বা পুত্রের কোন অধিকার নাই। যাহাকে ইচ্ছা সেই স্ত্রীধন আমাদের মেয়েরা দিয়া যাইতে পারে। যদি কাহাকেও দত্ত না হয় তা হোলে কন্যারা সেই স্ত্রীধনের অধিকারিণী হয়। তোমাদের স্ত্রীলোকদের এরূপ ক্ষমতা দশ বৎসর আগে ছিল না। আর

আমাদের স্ত্রীলোকদের ক্ষমতা গৃহস্থালী ব্যাপারে এক প্রকার অসীম। তোমাদের দেশে বিধবা মা-বোন গতর খাটিয়ে খায় আর পুত্র এবং ভ্রাতা গাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া খেয়ে জুড়ি চড়ে। বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা বড় শুভফলপ্রদ নহে। তোমরা মনে কর যে, পরিণয় এক চির-মধু-যামিনী (Perpetual honey-moon) সম্ভোগের ব্যাপার আর উদ্দাম-প্রবৃত্তি যুবকযুবতীরা ভোগবাসনা নিরত হইয়াই প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। শতকরা একজনও মঙ্গলভাব-প্রণোদিত হইয়া উদ্বাহবন্ধন স্বীকার করে না, তাই তোমাদের সমাজে এত শিথিলতা দাঁড়াইতেছে। বিবাহের মাধুর্য যেমনি পুরানো ও পান্‌সে হয়ে যায়, অমনি চঞ্চলতা এসে গৃহের মঙ্গল-লক্ষ্মীকে দূর করে দেয়। হিন্দুর আদর্শ ভিন্ন। হিন্দু পিতৃঋণ-পরি-শোধার্থে বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহ সম্ভোগের জন্য নয়। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বরূপ মঙ্গলভাব করণের জন্য। হিন্দু তাই চঞ্চলস্বভাব যুবক-যুবতীর হাতে পরিণয়ের গুরুভার দেয় না। পিতামাতাই ভাল কুলশীল দেখে পাত্রপাত্রী স্থির করে। কতকগুলি পাদরি গূঢ় কথা বুঝতে পারে না, তাই মিথ্যা মিথ্যা আমাদের নিন্দা করে। এই বক্তৃতার পর কেমব্রিজ শহরে খুব একটা গোল হয়ে গেছে। আমার কালেজেতে বক্তৃতার দিন এক পাদরি কি আমাদের দেশের বিরুদ্ধে বলতে উঠেছিল, অমনি সভাপতি তাকে দুই ধমক দিলেন আর শ্রোতৃবর্গের হাততালির চোটে তাকে একেবারে দাঁড়িয়ে মাটি করে দিলে।

এখানে মেয়েদের বড় কষ্ট। চেহারা ভাল না হোলে বিয়ে হয় না। বাপের টাকা থাকলে সুবিধে হোতে পারে, কিন্তু বড়ই মুশকিল। যদি টিপকপালী বা চিরুণদাঁতী হয় তা হোলে কেউ তাদের গ্রাহ্য করে না। যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীর দল এত বেশী যে পায়ে ঠেকে। বিলেতে মেয়ের সংখ্যা অধিক, শতকরা ৬০। এই অবিবাহিতা মেয়েদের অধি-কাংশকে খেটে খেতে হয়। গৃহস্থের মেয়েরা তাই লেখাপড়া শেখেও মেয়ে স্কুলে ডাকঘরে তারঘরে দোকানে ও অন্যান্য জায়গায় চাকরি পায়।

কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডে ও কেমব্রিজে মেয়েদের পড়তে দিত

না। এখন পড়তে দেয় কিন্তু উপাধি B.A, M.A. Degree দেয় না। একজন বিদুষী স্ত্রীলোক এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিন্দা করছিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, ঘরে একে ত তোমাদের শাসনে পুরুষ অস্থির আকার, উপাধিধারিণী ফেলো হোলে সেনেট সিনডিকেটে পুরুষদের উত্তম্ ফুত্তম্ করবে। এতটা সহা যায় না। এই কথা বলাতেই একেবারে খুব হাসি। সেখানে আরো অনেক অধ্যাপিকা ছিলেন। এঁরা আমার বক্তৃতা শুনে তাঁদের মেয়ে-কলেজ দেখাতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে খুব খাতির করে-ছিলেন। তাই সাহস কোরে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে পেরেছিলাম।

এখন আর আমার বক্তৃতার গোল নাই। বঙ্গবাসীতে নিয়মমত চিঠি লিখতে চেষ্টা করবো। ইতি—

৫ই মে, ১৯০৩ বি. উপাধ্যায়

নয়

আমি অক্ষফোর্ডে যে গৃহস্থের বাড়িতে থাকি তারা সামান্য রকম লোক কিন্তু ভদ্র। কর্তা প্রায় একশত টাকা মাসিক রোজগার করেন —অর্থাৎ আমাদের দেশের ২৫।৩০৲ টাকার কেরানীর মত অবস্থাপন্ন। গৃহিণী সুশিক্ষিতা—বিবাহের পূর্বে শিক্ষকের কার্য করিতেন। তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র। বড় মেয়েটি এক ফারমে কেরানীর কাজ করে। আমাকে এরা সকলেই খুব খাতির-যত্ন করে। আমি একটি বড়ঘরে থাকি। ঘরটি ফুলদার রঙীন কাগজে মোড়া। মেজে কারপেট বিছানো। একটি সোফা (Sofa), ইজিচেয়ার (Easy chair) তিনখানি গদি-মোড়া কেদারা, তিনটি ত্রিপাই (Tripoy) ও একটা বড় মেজ। দেওয়ালে খান বারো নানা রকমের ছবি সাজানো আছে। আর এক-খানা গিল্‌টির কাজ-করা ফ্রেম-দেওয়া বড় আরশি আছে, তাতে উঠতে

বসতে আমার চাঁদমুখ দেখতে পাই। আহা যদি নিজেকে ভালবাসতাম তা হোলে কি আনন্দই না হোত। কিন্তু আমার কপাল এমনি মন্দ যে, যাদের সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা তারা প্রায় সকলেই আমার চেয়ে সুশ্রী—নয় গুণবান্। তাই ছেলেবেলা থেকে নিজের উপর বড় ভাবভক্তি হয় না। তবে চেহারা যে একেবারে মন্দ তা নয় কিন্তু ভালবাসার যুগ্যি নয়। যাক্ নিজের কথা। ঘরটিতে তুটি জানালা। তাতে নেটের ফুলকরা পরদা টাঙান। স্প্রিং-এর একখানি খাট বেশ গদিপাতা। দেশে কম্বলে মাতুরে শুয়ে বৈরাগ্যসাধন করতাম। এখানে বৈরাগ্য-টৈরাগ্য কোথায় ভেসে গেছে। প্রাতে উঠে মুখহাত ধুয়েই খাওয়া। তু পেয়ালা চা—চার টুকরা রুটি, একতাল মাখন ও এক পেলেট পরিজ (Porridge) অর্থাৎ সিদ্ধকরা কোন শস্য—আমি রোজ বেলা ৮৷৷০ টার সময় উদরসাৎ করি। ইহাকে উপবাস-ভঞ্জন (Breakfast) বলে। তারপর বেলা একটার সময় লাঞ্চ (Lunch) অর্থাৎ মধ্যাহ্নের আহাব। ভাত ডাল আলুভাজা কপির তরকারী রুটি মাখন ও ফল ইত্যাদি খাই। আবার চারিটার সময় টোস্ট অর্থাৎ রুটি মাখনে ভাজা—কেক আর তু পেয়ালা চা অবাধে গ্রহণ করি। রাত্রি আটটার সময় ডিনার (Dinner) অর্থাৎ প্রধান আহার। আমি প্রায়ই আলু, বরবটি ও কলাই শুঁটির তরকারি রুটি ও পুডিং (Pudding) খাই। এখনও শেষ হয় নি। শোবার আগে এক পেয়ালা গরম তুগ্ধ পান করি। দেশে যদি এত খাই তা হোলে তু চার দিনেই শমন-ভবন গমন করিতে হয়। তবু আমি এখানে একজন মস্ত সাধু। মাছ মাংস ডিম কিছু খাই না—কি কোরে বাঁচি তাই সবাই অবাক। এখানকার নিরামিষাশীরা (Vegetarian) ডিম খায়, কেননা ডিমের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এখানে যেমন খাওয়া তেমনি পরিশ্রম করা চাই। ছ সাত মাইল অন্ততঃ রোজ না বেড়ালে অসুখ করে। আমার শরীর বেশ শুধরে গেছে। চেহারা লাল হোয়ে উঠেছে। কিন্তু মাসে ৫০টি করে টাকা দিতে হয়। এর চেয়ে সস্তা হয় না। গৃহিণী

মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন করেও খাওয়ান। আর ডিম খাইনে বোলে প্রায়ই ডিম না দিয়ে কেক্ তৈয়ারী করেন। কাপড়-চোপড় নিজেই কেচে দেন, ধোপার খরচ লাগে না। বাড়িতে ইস্ত্রি করবার বন্দোবস্ত আছে। ইজের মোজা ছিঁড়ে গেলে খুব ভাল রকম নিজে রিপু কোরে দেন। গৃহিণী বড় পরিশ্রমী। দাসী নাই। সমস্ত দিন রান্না ও ঘরকন্নার কাজ তাঁহাকে করিতে হয়। আমার উপর এঁর কিছু ভক্তি হয়েছে। এক একদিন সময় হোলে আমার কাছে এসে ধর্মোপদেশ নেন। সংসারের ভাবনার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি কি প্রকারে মিশাইতে হয় তাহা আমি এঁকে বলি। তাই অনেকটা গুরুর মতন সেবা পাই। ছোট ছোট মেয়েগুলি সদাই ব্যস্ত পাছে আমার খাবার-দাবারের কোন ত্রুটি হয়। বড় মেয়েটি একদিন আমার খাবার দিতে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে একটু নুন ছড়িয়ে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি। সে বললে যে আসতে আসতে নুন ফেলে দিয়েছিল। নুন ফেলা বড় অলক্ষণ। তাই ঐরকম কোরে অলক্ষণের কাটান করিতে হয়। আমাদের দেশেও অনেক স্থানে এই রকম প্রথা আছে—যেমন তেল পড়ে গেলে সেই জায়গায় একটু জলের ছিটে দিতে হয়। এখানে ঐপ্রকার অনেক সরল প্রথা আছে। সভ্যতার প্রকোপে আমাদের দেশে ভারতবর্ষে কত না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার-ব্যবহারকে কুসংস্কার বোলে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। সভ্যতার দেশেই কিন্তু কুসংস্কার বেশী। গৃহিণীর এক ভগ্নী তার মামাতো ভাইকে বিয়ে করবে বোলে ক্ষেপেছে। মামা ভয়ানক চটেছেন। ছেলেকে বিষয় দেবে না বোলে ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রণয়িযুগল অটল। তাই গৃহিণী দুঃখ কোরে আমায় বলছিলেন যে, মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনে বিয়ে বড় মন্দ। একটা ইংরেজিতে ছড়া বললেন—সেটা আমি ভুলে গেছি। তার অর্থ এই যে, ঐপ্রকার বিয়েতে স্বাস্থ্য ও অর্থনাশ হয়, আর বন্ধ্যাদোষ হয়। বললেন—যতগুলা আমি দেখেছি ততগুলা ঐরকম। তার সাক্ষী আমাদের পাড়াতেই এক ঘর বুড়ো-বুড়ী স্বামী-স্ত্রী আছে। তারা খুড়তুতো ভাই

বোন। তাদের সব টাকা ও ব্যবসায় নষ্ট হোয়েছে—ছেলেপিলে হয় নাই আর তারা রোগে জীর্ণ। এত দেখে-শুনেও তাঁর বোনের কেন এমন কুমতি হোলো তাই বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমরা সকলেই জানি যে, ইংরেজের প্রাণ অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নির্ভরটা কতদূর তা বোধ হয় অনেকেই জানে না। বিলেতে প্রতি বৎসর প্রায় ছয় কোটি মণ গম আমদানি হয়। মার্কিণ মুলুক হোতে তিন কোটি মণ আসে। কানেডা হোতে পঁয়ষট্টি লাখ মণ ও হিন্দুস্থান হোতে ষাট লাখ মণ গম আসে। বাকি অন্যান্য দেশ যোগায়। গম ছাড়া ময়দা ১ কোটি ৮০ লাখ মণ। যবও প্রায় অত। জুয়ারি (Maize) তিন কোটি মণ। ভেড়ার মাংস দেড় কোটি মণ ও ১০ লাখ মণ শূকরের মাংস বিদেশ থেকে আসে। তাই ইংরেজের ব্যবসাগত প্রাণ।

মিস্টার চেম্বারলেন এখানে এক ভারি গোল বাধিয়েছেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন যে, উপনিবেশের আমদানি মালের উপর মাশুল কম কোরে অন্য দেশের মালের উপর মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। উপনিবেশ সকল আমাদের পরিবারভুক্ত; তজ্জন্য তাদের মাল ও দেশের মাল এক মনে করা উচিত। আর তা হোলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ও উপনিবেশ সকলের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হবে ও বৃটিশ সাম্রাজ্য বললাভ করবে। এখন মুশকিল এই যে, শস্য, মাংস ও অন্যান্য মাল উপনিবেশ হোতে খুব কম আসে। তাই বিদেশীয় মালের শুল্ক বাড়ালেই আহারীয় দ্রব্যের দর চোড়ে যাবে। এই কথা নিয়ে কাল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় হুলস্থূল বেধে গিয়েছিল। রাজস্ব-সচিব মিস্টার রিচি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে, ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি মিস্টার চেম্বারলেনের প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত। সচিবে সচিবে মতভেদ বড় দেখা যায় না। উদারপক্ষের (Liberal) মেম্বরেরা ভারি খুশি। গবর্ণমেণ্টকে খুব চেপে ধরেছে। আর গবর্ণমেণ্টের পক্ষের মেম্বরেরা অনেকেই চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর এক বিপদ। যে শিক্ষাবিধি (Education Act)

পাশ হোয়েছে তাতে লোকেরা ভারি চটেছে। ইংলিশ চার্চের (Church of England) বিরুদ্ধ সম্প্রদায়েরা (Nonconformist) মনে করে যে, এই বিধি অনুযায়ী চলিলে সব ইস্কুল ইংলিশ চার্চের হাতে আসিবে। তাই তারা শহরে শহরে ধর্মঘট কোরেছে যে, শিক্ষার জন্য যে ট্যাক্স তা কেউ দেবে না। বড় বড় লোক এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। যারা ট্যাক্স দিচ্ছে না তাদের আসবাবপত্র সরকারে নীলাম করে ট্যাক্স আদায় করছে কিন্তু লোকে তবুও শুনছে না। বিদ্রোহ ক্রমশঃই বাড়ছে। ইংরেজ বিধির বড়ই বশ, কিন্তু তারা ধর্মহানির ভয়ে এবার বিধির বিরোধী হোয়েছে। গবর্ণমেণ্টের বডই বিপদ।

ইংরেজ হিন্দুজাতিকে নিযে বড়ই মুশকিলে পড়েছে। জাতি শ্বেতবর্ণ না হোলেই কাফ্রি বা জুলুদের মত অসভ্য—এইরূপ এদের ধারণা ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে তারা সে ধারণাটা হৃদয়ে পোষণ করতে বড় সুবিধা পায় না। হিন্দুজাতি যে ইংরেজের অপেক্ষা সভ্য তার আর কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে পদে পদে এদের চোখ ফুটছে কিন্তু পূর্বসংস্কার ছাড়িতে চায় না। আমরা ইংরেজ বা ইয়ুরোপীয়—আমরাই সভ্য—আর সব অসভ্য—এই বুলি। ডাক্তার ফেয়ারবেয়ারন (Dr. Fairbairn) ও ডাক্তার ড্যাড (Dr. Dadd) আমাদের দেশে দর্শন শিখাইতে গিয়েছিলেন। ভাল কথা। কিন্তু গিয়ে দেখিলেন যে, হিন্দুর দর্শন তাঁদের দর্শনের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। তাই বড় একটা পসার হোলো না। এই রাগ। দাও গালাগালি হিন্দুদিগকে। ডাক্তার ফেয়ারবেয়ারন উক্সপারে আছেন। বেদান্তের সম্বন্ধে জানিতে এখানে অনেক অধ্যাপক উৎসুক, কিন্তু ইনি একেবারে বীতরাগ। হিন্দু দর্শনের উপর এঁর কিছু শ্রদ্ধা নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে, এখানে ইনি গাঁয়ে-মানেনা-আপনি-মোড়ল গোছের লোক। আমাদের দেশের লোক মনে করেছিল যে, কোন একটা দিগ্‌গজ এসেছেন। কিন্তু উক্সপারে এঁর প্রতিপত্তি ভারি কম। ডাক্তার ড্যাড ত স্পষ্ট লিখেছেন যে, হিন্দুরা মিথ্যাবাদী ও দুশ্চরিত্র। যে ইংরেজ ভারতে যায় সে-ই হিন্দুর

বিষয় কিছু-না-কিছু লেখে। এখানে এত বই বেরিয়েছে যে, আমরা তার খবরই জানি না। কিন্তু প্রায় সবগুলি হিন্দুর নিন্দায় ভরা। এঁর উপায় কি! উপায় রাঙ্গা পায়। আমাদের দেশীয় ধুরন্ধরেরাও হিন্দুর নিন্দা করিতে ছাড়েন না। রমেশবাবুর 'হিন্দু-সভ্যতা' নামক পুস্তকখানিতে হিন্দুর নামকে যে কি মাটি কোরেছেন তা বলা যায় না। তাঁর গ্রন্থের মর্ম যে, আমরা কোনও পুবাকালে একটু আধটু সভ্য ছিলাম—তা আবার সে সভ্যতাটুকুও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে লোপ পেয়েছে। যাক্ তাঁর আর নিন্দা করিব না। তিনি দেশ-হিতৈষী। ইংরেজের কাছে তিনি আমাদের দারিদ্র্যের ওকালতি করেন—তাঁর মঙ্গল হোক।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বেদান্তদর্শন শিক্ষা হয় সেই বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। যদি হয় ত বড় ভাল হয়। কতকগুলো বিলাতি ভূতুড়ে লোক আর বিলাতি মেয়েমানুষের হাত থেকে হিন্দুয়ানির পাণ্ডাগিরি যতদিন না যায়, ততদিন অমঙ্গল বই মঙ্গল নয়। যারা উচ্চশিক্ষিত তারা ঐ অর্ধশিক্ষিত প্রেতাত্মা মহাত্মা-গ্রস্ত উদ্ভুট্রে বিলাতি হিন্দুদের ঘৃণা করে। এই পাণ্ডার দল—দর্শন কি বস্তু তার বড় খোঁজ রাখে না কিন্তু কেবল নিজেদের দেশের নিন্দা ও কুৎসা করে আর না বুঝে-সুঝে হিন্দুর বিষয় নিয়ে চীৎকার করে। যত স্বদেশদ্রোহী আর নব-নব-কৌতূহল-বিলাসিনী নারীগণের দ্বারা এই দল পরিপুষ্ট। হিন্দুত্বের যে এখানে কি দুর্দশা—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। অথচ আমাদের দেশে হৈ চৈ পোড়ে গেছে যে, বিলেতে হিন্দুয়ানির আদর বাড়ছে।

উক্ষপার দার্শনিক সভা আমায় নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অনেক অধ্যাপক এই সভায় আসেন। এইরকম বলিতে বলিতে যদি কিছু ফল হয়। আগামী রবিবারে ঐ সভার অধিবেশন হবে।

উক্ষপার,

১২ই জুন, ১৯০৩

বিলাত-ফেরত সন্ন্যাসীর চিঠি

মহামায়ার কৃপায় আমি দেশে ফিরে এসেছি। বেঁচে গেছি, হাড় জুড়িয়েছে। কি আড়ষ্ট হোয়েই না বিলেতে থাকতে হোতো। সকাল বেলা বুটস্যুট এঁটে শয়ন-ঘর থেকে যে বেরুনো—আবার সেই শোবার সময় রাত্রিতে রাজ-সাজ খোলা। সমস্ত দিন মোজাবন্ধ কোমর-বন্ধ গলাবন্ধ প্রভৃতি নানারূপ বন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। খাবার সময় যে একটু হাঁ করে খাবো তার যো নেই। আবার যদি খেতে খেতে আওয়াজ হয়—একটু সপ্‌-সপ্‌ চপ্‌-চপ্‌ মড়-মড় বা কট্ কট্—তা হোলে নিন্দার আর সীমা থাকে না। এখানে ঘরে এসে হাঁ করে খেয়ে বাঁচি। আর দধি-সন্দেশের হাপরানি-ধ্বনি প্রাণটাকে আবার মধুময় কোরে তুলেছে।

দেশে এসে বিশুদ্ধ বাঙালী খাওয়া খেতে বড়ই স্পৃহা হোয়েছিল। আমার ঘরদোর নাই, তবে গৃহস্থ বন্ধু-বান্ধবদের কৃপায় সব খেদ ঘুচে গেছে। আহা সজ্‌নে সড়সড়ি কী মিষ্টি—যেন বিরহীর পুনর্মিলন সুখের আভাস পাওয়া যায়—

সজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।
আমার ডাক পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥

সজ্‌নে—বাস্তবিকই তুমি বিপন্নের বন্ধু। আবার লাউডগা-ভাতে—কচুর শাক, মোচার ঘণ্ট ও কচি আমড়ার টক খেয়ে মনে করেছি যে পারতপক্ষে বঙ্গমাতার কোল ছেড়ে আর কোথাও যাব না। বন্ধুদের কৃপা আমড়ার টকের চেয়েও ঢের বেশীদূর গড়িয়েছে। কাঁচাগোল্লা রসগোল্লা ক্ষীর পায়েস ইত্যাদি চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়ের দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করেছি। হা হতভাগ্য ইংরেজ, তোমার কপালে রসগোল্লা নেই, তাই ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয় না। তুমি হিন্দু দর্শন পড়িবে স্বীকার করেছ। কিন্তু তোমার আড়ষ্ট জিভ যদি কোনদিন জামাই-তত্ত্ব

রসগোল্লার রসে সাঁতার দেয়—তুমি বুঝতে পারবে যে আর্যজাতি কত মহৎ এবং কত রসিক।

দুই একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আমার বঙ্গবাসীর চিঠিতে কুরুচি আছে বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। কোন এক ভদ্রলোকের বাগানে একটি বকুল গাছ আছে। একটি ব্রাহ্ম প্রতিবাদ করেন যে ঐ অশ্লীল বৃক্ষটি রাখা উচিত নহে। ভদ্রলোকটি বলেন যে বকুল গাছের থাকা না থাকার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, কিন্তু ঐ বকুলে যে একটি অশ্লীল পাখী অর্থাৎ কোকিল এসে বসে তার উপায় কি। আমিও তদ্রূপ নিরুপায়। প্রণয় বিরহ বা রূপমধু-পান ইত্যাদি প্রয়োগ প্রবাসীর চিঠিতে অনিবার্য। যাহা হউক এখন তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে একটা আসল কথা বলি।

ইয়ুরোপীয়দিগের প্রায়ই এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতেছে যে, শ্বেতাঙ্গ জাতি মানবকুল-শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য জাতি—গৌর শ্যাম ও কৃষ্ণ— তাহাদিগের দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছে। এই প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা যেন একটা আসুরিক ভাব। ইহা পৃথিবীতে অনেক অমঙ্গল আনিয়াছে ও আনিবে। এই ভাব প্রবল হইলে ভারতের যে কী হানি হইবে তাহা প্রকাশ করা কঠিন। এই বিপদ কাটাইবার জন্য একটি উপায় অনেকদিন ধোরে আমার মনে হইতেছে। যদি ভারত পুরাকালের ন্যায় আবার পৃথিবীর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়— যদি য়ুরোপ হোতে ছাত্রসকল ভারতবর্ষে দর্শন ন্যায় স্মৃতি সাহিত্য পাঠ করিতে আসে তাহা হইলে ভারতের প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের শ্রদ্ধা হইবে এবং ঐ আসুরিক ভাবের হ্রাস হইবে। ভারত যে এখনও জগতের গুরুস্থানীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে, তাই আজ অর্ধশিক্ষিত ইংরেজ ভারতবাসীদিগকে কাউপার (Cowper) ও পোপ (Pope) মুখস্থ করাইয়া সাহিত্য শিখাইতেছে ও মারটিনোর (Martineau) ব্যাখ্যা করিয়া দর্শন শাস্ত্র উপদেশ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। এই

আত্মবিস্মৃতি কিসে যায় ? আমি ভাবিলাম আমাদের শাস্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয় তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে ও ইংরেজেরও মঙ্গল হইবে। তজ্জন্য বিলাত-যাত্রা করিয়াছিলাম। গিয়া দেখি মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের প্রয়াসে ভারতের কিছু সম্মান বাড়িয়াছে বটে—কিন্তু সে সম্মান না হওয়া ভাল ছিল। ইংরেজের ধারণা জন্মিয়াছে যে হিন্দুজাতি এক সময়ে বড় ছিল, কিন্তু এখন মরিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার ঠাটমাত্র বজায় আছে। যেমন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মিউজিয়মে কোন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের কঙ্কাল দেখিতে যান ও বিচার করেন যে, এই জীব কতদিন বাঁচিয়াছিল—কেনই বা এখন লোপ পাইয়াছে—তদ্রূপ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের বিষয়ের আলোচনা করেন। আমরা এককালে বড় ছিলাম কিন্তু এখন সভ্যজগতের কাছে আমরা একটা কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু হোয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি এই সংস্কার দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে হিন্দুজাতি এখনও জীবন্ত। সহস্র সহস্র বৎসর হইয়া গিয়াছে তথাপি কালের প্রভাবে হিন্দু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। কত সভ্য জাতি ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে কিন্তু হিন্দুজাতি মরণকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। কত উৎপাত কত শোষণ কত বিপ্লব ভারতকে বিতাড়িত ও বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। অন্য কোন দেশ ভারতের ন্যায় প্রপীড়িত ও দলিত হইয়াছে কি না সন্দেহ, তবুও হিন্দু সপ্রাণ ও সতেজ। ইহার কারণ কি ? বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বৈতজ্ঞান হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন ও চিরসহায়। হিন্দুর যোগ-দর্শন স্মৃতি-সাহিত্য বিধি-ব্যবস্থা আচার-ব্যবহার-সংস্কার অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট। অদ্বৈতমুখীন নিষ্কাম ধর্মপালনে হিন্দু রক্ষিত ও বর্ধিত হইয়াছে। আমার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া কেমব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। হিন্দু দর্শন তথায় নিয়মিত-রূপে পঠিত ও আলোচিত হয়—এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি কমিটি

গঠিত করিয়াছেন। একজন উপযুক্ত হিন্দু পণ্ডিত প্রেরিত হইলে এই কমিটি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহাকে তিন বৎসরের জন্য হিন্দু-দর্শনের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করাইবেন। নয় হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিতে হইবে। এই নয় হাজার টাকা অধ্যাপকের বেতন স্বরূপ—বার্ষিক তিন হাজার টাকা করিয়া তিন বৎসর দেওয়া হইবে। আছেন কি কোন মহাজন যে এই নয় হাজাব টাকা দিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত ? বিলাতে হিন্দুর দ্বারা হিন্দু-দর্শন অধ্যাপিত হইলে আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘুচিতে পারে ও ভারত যে সকল জাতির গুরু, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ আরম্ভ হইবে। কিন্তু যতদিন না ইয়ুরোপীয়েরা ভারতে হিন্দুর জ্ঞান ও ব্যবহার-শাস্ত্র শিখিতে আসে ততদিন আমার মন উঠিবে না। ভারতে এক বিশ্বজনীন সরস্বতীর পীঠস্থান কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার স্বপ্ন সদাই দেখি। স্বপ্ন যাহাতে সত্য হয় তাহার অল্প-স্বল্প আয়োজনও করিতেছি। তবে তাহা বীজবপন মাত্র। ফলের কথা অনেক দূর।

ইংবেজ যদি বেদান্তের অদ্বৈতবিজ্ঞান শিক্ষা করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের নিজের ধর্ম ও শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, আর তাহাদের সর্বনেশে আসুরিক ভাব দূর হইবে। এইরূপে তাহাদেরও মঙ্গল এবং আমাদেবও মঙ্গল সাধিত হইবে। বিলাত দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হোয়েছে যে সভ্যতা সামাজিকতা লৌকতা আচার-ব্যবহার—এই সকল বিষয়ে হিন্দুজাতি ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বড়। যে নব্য সংস্কারকেরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা দেখিয়া হিন্দুকে হীন মনে করেন তাঁহারা অত্যন্ত কৃপাপাত্র। আমাদের দেশে এক্ষণে যে অনাচার বা কুসংস্কার নাই তাহা নহে। আর ইংরেজের কাছে যে কিছু শিখিবার নাই তাহাও নহে। কিন্তু একথা প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুর আন্তরিক উদারতা ও উন্নত ভাবের নিকট ইংরেজের বাহ্য রঙ ঢঙ কিছুই নয়।

আমি বারমিংহাম্ নগরে একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের বাটীতে

অতিথি হোয়েছিলাম। তাঁহার পত্নী বড় বিদুষী। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের দেশের কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বিদ্যার আদর কি প্রকার তা জানিতে বড়ই ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন। আমি বলিলাম যে, খুব নীচজাতি ছাড়া এমন হিন্দু নাই যাহারা অল্প-স্বল্প লিখিতে পড়িতে জানে না। কেন-না হিন্দুর বিদ্যাশিক্ষা ঋষি-ঋণ শোধ করিবার জন্য—নিজের গৌরবের জন্য নয়। আমাদের হাতে-খড়ি দেওয়া যে একটি ধর্মকার্য তাহা শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁরা বলিলেন যে, আমরা কত আইন-কানুন কোরেও এপ্রকার লেখাপড়ার প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা দাঁড় করাইতে পারি নাই। আমাদের পণ্ডিতদের উপাধি শুনিয়া তাঁরা বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর (Ocean of Learning)—ন্যায়বাচস্পতি (Lord of Wisdom in Logic)—তর্করত্ন (Jewel in Disputation) ইত্যাদি উপাধির কথা বোলেছিলাম। শেষ উপাধিটি শুনিয়া দার্শনিকের পত্নী বললেন - জন (দার্শনিকের ঐ নাম)—তুমি ভারি তার্কিক—তুমি তর্করত্ন উপাধিটি গ্রহণ কর। বাস্তবিক সেদিন কবে আসবে—যেদিন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের কাছ থেকে উপাধি পেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

ইংরেজের পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। আমি উক্সপারে দিন কতকের জন্য এক বাসায় ছিলাম। একটি বৃদ্ধা ও তাহার কন্যা সেই বাসাটি রেখেছে। তারা সমস্তদিন দাস্যবৃত্তি কোরে আপনাদের ভরণপোষণ করে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধার পুত্র একটি জাহাজের কাপ্তেন—বেশ দু-পয়সা পায়। কিন্তু সে নিজে ভদ্রলোকের মত থাকে ও সব টাকা খরচ করে। মা ও ভগ্নী যেমন দাসী তেমনই আছে। বেশ-বিলাসের খরচ কমাইয়া মা ও ভগ্নীকে যে কোন রকম আর্থিক সাহায্য করা উচিত সে ভাবনা কাপ্তেন বাবুর মনেই হয় না। ইংরেজ-সমাজের চক্ষে এরূপ ব্যবহার কিছু অন্যায় বোলে বোধ হয় না। এরকম ব্যাপার আকছার দেখা যায়।

ছেলে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে, আর বাপ-মা দাস্যবৃত্তি কোরে জীবিকা নির্বাহ কোচ্চে। বাপ-মার সঙ্গে যখন এইরূপ সম্বন্ধ তখন অপর অপর কুটুম্বদের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকের সম্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে কিরকম হয় তাহা ইংরেজদের হিন্দু-জাতির কাছে ভাল কোরে শেখা দরকার। কিন্তু উল্টাশ্রী দাঁড়িয়েছে। নব্য বাবু-সংস্কারকেরা বলেন যে, আমাদের ঐ বিষয় ইংরেজের কাছে শেখা উচিত। ইংরেজের কাছে স্ত্রীলোকের আদর শিখতে গিয়ে সংস্কারকেরা কি বিপদই যে ঘটাইয়াছেন তা অনেকেরই জানা আছে। স্ত্রীলোকের আদর বলিলে—ইংরেজের কাছে কেবল নিজের পত্নীর আদর বোঝায়—মা বোন ভাজ ভাইঝি বা অন্য কোন কুটুম্বিনীর বোঝায় না। তারা মরুক বাঁচুক আর ভিক্ষা করুক তাতে আমার কি। এইরূপ শিক্ষা ইংরেজের কাছে পাওয়া যায়।

ইংরেজের সভ্যতা, আচার ব্যবহার ও শীলের কথা পরে আরও লিখিব। এখন একটা কথা বোলে চিঠিটা শেষ করি।

আমি একদিনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ স্টেড্ সাহেবের (Mr. Stead) অতিথি হোয়েছিলাম। তাঁহার আপিসে একটি সভা হয়, সেখানে আমি বক্তৃতা করি। মিস্টার স্টেড্ আমার সঙ্গে অনেক গল্পগাছা করেন। তিনি বোল্লেন যে, তাঁর একটি ডবল (Double) আছে অর্থাৎ তাঁহার শরীর হইতে হুবহু আর একটি স্টেড্ সাহেব বাহির হয়। এই ডবলটি যথেচ্ছ বিচরণ করে। তিনি বোল্লেন যে, একবার তাঁর কোন এক রমণী বন্ধুর জ্বর (Influenza) হয়। সেই ডবল—তাঁহাকে তিন দিন তিন রাত সেবা করে। ঐ রমণী সুস্থ হোয়ে মিস্টার স্টেড্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে আসে। স্টেড্ সাহেব একেবারে অবাক্। তিনি ঐ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এইরূপে এই ডবলটি অবাধ্য ছেলের মত যেখানে খুশী ঘুরে বেড়ায়। আমার শুনে পিলে চম্‌কে গেল। স্টেড্ সাহেব কি আনতে একবার ঘর থেকে বাহিরে গিয়েছিলেন। তার পর যখন ঘুরে ঢুকছেন আমার ভারি

আতঙ্ক হোলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি আসছেন, না আপনার ডবল আসছেন। তিনি হেসে বোল্লেন—আমি—আমার ডবল নহি। আমি আবার ভয়ে ভয়ে বলিলাম, কি করে জানবো। তিনি উত্তরে বলিলেন যে, আমার চুল পাকা আর আমি চুরুট খাই কিন্তু আমার ডবলের চুল পাকা নহে, আর সে চুরুটও খায় না। আরও যে কতরকম ভূতুড়ে গল্প করিলেন তাহা লিখিলে বঙ্গবাসী ভোরে যায়। আমি ত সকাল বেলাই চম্পট দিলাম। আর ভূতের ভয়ে তাঁর সঙ্গে বড় একটা দেখাশুনা করিনি, আর কোন সম্পর্কও রাখিনি। তবে তিনি আমাদের দেশের বন্ধু। আসিবার সময় দেখা করে এসেছিলাম। তিনি কেমব্রিজের কমিটির কথা আগেই শুনেছিলেন। অত্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ প্রকাশ করলেন। ইতি। তারিখ—

৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতা

বাংলার পাল-পার্বণ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব

বিংশতি কোটি হিন্দুসন্তান আজ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কৃষ্ণভাবের ভাবুক। আমাদের আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধন—সমস্তই কৃষ্ণপ্রচারিত নিবৃত্তিমার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণবদনকমল হইতে যে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইয়াছে উহাই এই ঘোর কলিযুগে হিন্দুজাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কত বিপদ কত বিপ্লব কত ঘাত কত প্রতিঘাত—কিন্তু হিন্দুজাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই—কৃষ্ণপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অমৃততত্ত্ব প্রচার করেন তাহা জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুজাতির জ্ঞান ভক্তি ধর্ম কর্ম ও সমাজকে নূতন তেজ নূতন শক্তি নূতন গৌরব প্রদান করিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া যত ধর্মান্দোলন হইয়াছে উহা সমস্তই সেই কৃষ্ণপাদপদ্মপ্রসূত জ্ঞানগঙ্গার বীচিবিক্ষোভ মাত্র। এইরূপ সুদূরব্যাপী যুগপ্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না।

পুরাতন যুগের অন্তে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্মসংস্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই আমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া অনেকে মানেন বটে, কিন্তু তিনি যে আমাদের নূতন জীবনের মূল—এ তথ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। হিন্দুর জীবন্ত, বহন্ত ইতিহাস তাঁহারই শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারই শিক্ষা তাঁহারই ধর্ম তাঁহারই আদর্শ হিন্দুর জ্ঞান ও সভ্যতাকে ক্রমবিকশিত করিয়া ভারতকে পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কি দুর্দশাগ্রস্তই না হইয়াছি। ক্ষুদ্র তড়াগের ন্যায় আজ আমরা অল্পপ্রাণ। তড়াগ স্বল্পতোয়া—সঙ্কীর্ণ গর্ভে অবস্থিত নিদাঘজ্বালায় সহজে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু

আপূর্যমাণা ভাগীরথী হিমালয়ের সলিলগাম্ভীর্য হইতে প্রসূতা ও জীবন্ত স্রোতের দ্বারা অবিরত পরিপুষ্টা। প্রখর করমালা উহাকে নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায় আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংবিন্দুগুলিকে কৃষ্ণচরণবিনির্গত জাতীয়-জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। হিন্দুর ঐতিহাসিক পারম্পর্য শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে প্রসূত। আইস—এই জন্মাষ্টমীর দিনে সেই পারম্পর্য স্বীকার করিয়া সকলে কৃষ্ণপদকল্পতরুমূলে অভেদসূত্রে এক হই। সেই দিনে ভারতের জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতার অধীনতা স্বীকার করিব—যত ঋষি মুনি হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের আশীর্বাদ লাভ করিব—যত অদ্বৈতাচার্য ভারতকে অলংকৃত করিয়াছেন তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব—যত শূববীর হিন্দুস্থানকে যশঃসৌরভে আমোদিত করিয়াছেন তাঁহাদের তেজে অনুপ্রাণিত হইব—সেই শুভদিনে সকল মহাজনের অমরপরম্পরায় আপনাদিগকে মিশাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে এক ভারতব্যাপী যুগব্যাপী নিবেদন অর্পণ করিব। শ্রীকৃষ্ণেই হিন্দুর নূতন জীবনের প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণ ছাড়িয়া দিলে ক্রমভঙ্গ হইবে—শুকাইয়া মরিয়া যাইতে হইবে। যাহারা মূলভ্রষ্ট—যাহারা পূর্ব-পুরুষদিগের সহিত পারম্পর্যসূত্রে মিলিত নহে তাহাদের মহানুভবতা মহাপ্রাণতা হইতে পারে না। আজকাল যে ইংরেজপ্রদত্ত অধিকার বা বিলাতি সাম্যবাদের বলে একতার আন্দোলন চলিতেছে উহার গভীরতা অতি অল্প। স্বজাতীয় ইতিহাসে যাহারা কোন আলোক বা শক্তি লাভ করে না তাহারা ভ্রষ্ট বা বিদ্রোহী।

আগামী কৃষ্ণজন্মমহোৎসব সারস্বত-আয়তন * নামে বিদ্যালয়ের

* সারস্বত আযতন উপাধ্যায মহাশযের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দির। স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পূর্ব হইতেই এই বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। দুঃখের বিষয় উপাধ্যায মহাশয়ের সহিত তাঁহার এই আযতনটি লোপ পাইয়াছে।

অধ্যাপক মহোদয়গণ ও ছাত্রবর্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের বালকেরা যাহাতে বুঝিতে পারে যে, হিন্দুজাতি ও সমাজ অতীতের সহিত অকাট্যভাবে গ্রথিত আছে—যে হিন্দুর জ্ঞান ধর্ম ও সামাজিকতা অটুট ও উদার—যে হিন্দুজাতি কৃষ্ণমন্ত্রপূত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে—তজ্জন্যই এই আয়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আয়তনের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ যে শুভ কৃষ্ণোৎসব সম্পাদন করিবেন ইহা তো স্বাভাবিক। ঐ শুভদিনে যাহাতে জনসাধারণ কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন তাহারই আয়োজন সারস্বত-আয়তনে করা হইবে। আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া একটি ছোট আমিকে নিবেদন করিলে চলিবে না। সমগ্র দেশের সহিত—অতীতের সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের অনুভূতির সহিত—স্বদেশানুরাগের মত্ততার সহিত এক বিরাট অভেদ-প্রাণ নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই মঙ্গল-দিবসে আমি নিজেকে নিবেদন করিব—আমার দেশকে নিবেদন করিব—ভারতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে নিবেদন করিব—স্বদেশীয় সমস্ত বস্তু নিবেদন করিব। এই উৎসর্গের পর নিবেদিত স্বদেশজাত দ্রব্যকে উপেক্ষা করিলে মহাপাতকে পড়িবে—পিতৃপিতামহদিগের অবমাননা করিবে ও মুসাধার শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী হইবে। এই আত্মনিবেদন করিয়া যদি কখনও হিন্দুর জ্ঞান ধর্ম সমাজ সভ্যতা ছাড়িয়া চলিয়া যাই—তাহা হইলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। কৃষ্ণ-বিদ্রোহীর গতি নাই। একটুকরা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া বিদেশীর প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিলে স্বদেশানুরাগ জন্মায় না। কৃষ্ণপাদপদ্মে ঋষিমুনি-দিগের সহিত এক হইয়া আপনাকে নিবেদন কর—স্বদেশকে নিবেদন কর—স্বদেশীয় দ্রব্যসকলও নিবেদন কর—দেখিবে যে কৃষ্ণপ্রভাবে স্বদেশপ্রেমবহ্নি তোমার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিবে।

জামাই-ষষ্ঠী

আগামী শুক্রবার জামাইষষ্ঠী। এই জামাইষষ্ঠীর কথা মনে হইলে আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

জামাই হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাতানো সম্পর্কেও কেহ কখন আমাকে জামাই বলিয়া ডাকে নাই। আর এ কাঠামোয় যে জামাই হইব সে আশাও নাই। চুল সাদা হইয়া আসিয়াছে—গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে—দাঁতগুলি হল হল করিয়া নড়িতেছে। দেহটি রসবিহীন পল্লববিরহিত পাদপের ন্যায় কোন প্রকারে তিষ্ঠিয়া আছে। বসন্তের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিয়া উঠে না। বিহগকূজন আর প্রাণকে আলোড়িত করে না। এখন প্রাণে যা মাঝে মাঝে সাড় হয় তাহা কেবল কাঠঠোকরার ঠকঠকানির জ্বালা বই আর কিছু নয়।

এত রসহীন এত শুষ্ক তবুও ষষ্ঠীবাটার ঘটায় মন পুলকিত হইয়া উঠে। ল্যাংড়া বোম্বাই মধুফলে বা বাগবাজারের রসগোল্লায় বা কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ায় আমার মন যে উথলিয়া উঠে তাহা নহে। আমি ধ্যানবলে মাতৃরূপিণী শ্বশ্রূঠাকরুনদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারি। ঐ কোমল হৃদয় কি ত্বরুত্বরু ত্বলিতেছে—কি সকরুণ উদ্বেলনে আলোড়িত হইতেছে। নব জামাতাকে আদর করিবার জন্য শাশুড়ী ঠাকরুন কতই না আয়োজন করিতেছেন! কত বকাবকি ঝকাঝকি ডাকাডাকি লইয়াই না ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি সদাই অচলা। এই প্রীতির কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার পুলকরোমাঞ্চ হয়। ঐ প্রীতি কি অপত্য স্নেহ? তাহা ত বটেই। কিন্তু উহাতে অন্য ভাবও সংমিশ্রিত আছে। আমার প্রাণপ্রতিম কন্যাকে সৎকুলে প্রদান করিয়াছি। আমার ত্বহিতা সেই কুলীন পরিবারের অলংকাররূপে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিবে। অবশেষে জননীরূপে সেই কুল রক্ষা করিবে। ইহা কি কম গর্বের

কথা। এইরূপ ধর্মসংগত সম্প্রদানের কথা মনে করিলে স্বাভাবিক ক্ষুদ্র স্নেহ বড়ই এক উদারভাব ধারণ করে। সেই উদার ভাব জামাইষষ্ঠীর দিন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

এই শুভদিনে কুলশীলসম্পন্ন সৎপাত্র আসিবেন। তিনি আত্মজার বর। আজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কত আমোদ। শ্যালিকারা ঠাট্টাতামাসা করিয়া জামাতার প্রাণকে মধুমাখা করিয়া তুলিবে। আর ব্রীড়াময়ী লতারূপিণী নববধূ আজ কি এক অজানিত আনন্দে বিবশা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যে শ্বশ্রূঠাকরুন উপবাসী থাকিবেন। তিনি ষষ্ঠীপূজা করিবেন, এ আনন্দের ভিতর আবার উপবাস কেন—পূজা কেন—বিধিনিষেধের বাধাবাধি কেন। ষষ্ঠীপূজা ও নারায়ণের উপাসনা না হইলে আমোদ-প্রমোদ সমস্তই বৃথা হইবে।

হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ। সংসাররক্ষার মহাব্রতে আমার ভোগসুখকে বলিদান দিতে হইবে। ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। তাই হিন্দুর গৃহে উদ্বেলযৌবন দম্পতির চাপল্যকে ধর্মবিধির দ্বারা সংযত করা হয়। দাম্পত্যের মধুর ভাববিলাস যাহাতে মঙ্গলময় জনকত্বের গাম্ভীর্যে পরিণত হয় তাহারই জন্য এই উপবাস—এই ষষ্ঠীপূজা। কন্যাসম্প্রদান যাহাতে সফল হয় তাহারই জন্য এই উৎসবের দিনে শ্বশুর শাশুড়ী নবদম্পতি শ্যালক-শ্যালিকা আত্মীয় কুটুম্বিনী সকলে ষষ্ঠীমাতার শরণাপন্ন হন ও তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া উৎসবের আনন্দ ভোগ করেন। বিবাহযজ্ঞে যে লোকরক্ষারূপ মঙ্গলকামনা করা হইয়াছিল তাহারই সিদ্ধির জন্য সুখময় ষষ্ঠীবাটা অনুষ্ঠিত হয়।

শাশুড়ী ঠাকরুন অত ভাবনা চিন্তা করিয়া তাঁহার ষষ্ঠীবাটার আয়োজন করেন না বটে, কিন্তু তিনি হিন্দুরমণী—তাঁহার ঐ মঙ্গল-সংস্কার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। স্বভাবতই ঐ উৎসবের দিনে তাঁহার এক অভূতপূর্ব উদারপ্রীতির সঞ্চার হয়। সেই প্রীতি যে বুঝিতে পারে সেই জানে যে হিন্দুর আদর্শ কি উচ্চ।

ষষ্ঠীবাটার মত অনুষ্ঠান আর কোথাও দেখা যায় না। হে সংস্কারক—একবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে হিন্দুর আচার-ব্যবহারগুলি দেখ। অনেক আবর্জনা আছে সত্য—আর আবর্জনা কোথায় বা নাই—কিন্তু দেখিবে হিন্দু আসলে খাঁটি সোনা।

স্নান-যাত্রা

যাত্রা বলিলে সচরাচর গমন বুঝায়। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অর্থ—উৎসব। তাই আমরা বলি রথযাত্রা দোলযাত্রা স্নানযাত্রা।

আজ স্নানযাত্রা। কাহার স্নান? আনন্দময় আপ্তকাম নির্গুণ পুরুষের আবার স্নান কিরূপে সম্ভবে? মানুষের এত বড় স্পর্ধা যে যিনি ভূমা যিনি অনন্ত তাঁহাকে কি না স্নান করাইয়া তুষ্ট করিতে চায়! মানুষ অতি ক্ষুদ্র—তাহার কোন দোষ নাই। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে মহৎকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। সে আকাঙ্ক্ষা স্পর্ধা নহে—উহা দৈবী। মায়াময় শ্রীহরি এতই প্রেমের বশ যে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নিজেই ছোট হন। যে ছোট—যে দীনদুঃখী—তাহার খাতিরে যদি মহান্ ছোট হন—তবেই মহতের মহত্ত্ব। প্রেমে ও বিনয়ে যত মহিমা—ঐশ্বর্যে তত নহে। যখন ভগবান্ স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্রভাব ধারণ করেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র প্রতিমা লইয়া ক্ষুদ্র ভক্তেরা যদি পূজা করে তাহা হইলে কোন দোষই স্পর্শে না, বরং ভগবানের প্রীতিই সাধিত হয়।

ভগবান্ প্রেমে ছোট হইয়া ধরা দেন কিন্তু তুমি যদি তাঁহাকে ছোট কর—তাঁহার অবমাননা হইবে। তুমি ধ্যানে তাঁহাকে ধরিতে পার না, তাই তিনি মাধুর্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া তোমার নিকট হইতে অভিষেক-লেপনাদি সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে তিনি স্নানশীল চন্দনপ্রার্থী—তোমার ঘোর অপরাধ হইবে।

যিনি কোটি বিশ্বকে প্লাবিত কবেন—যিনি অনন্ত আনন্দের আধার—তিনি কি স্নান বা চন্দনসুখের আকাঙ্ক্ষী। তুমি যাহাতে ক্ষুদ্রতার ভিতর দিয়া মহৎকে দেখিতে পার তাহারই জন্য তিনি ছোট হইয়া আসেন। আর তুমি যদি সেই প্রেমের বিকাশে কেবল ক্ষুদ্রতাই দেখ তাহা হইলে তুমি যে নীচ সেই নীচই থাকিবে--তোমার আর গতি হইবে না। সাবধান—আজ স্নানযাত্রার দিনে ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া দাও।

তুমি মনে কবিতেছ যে ভাবি ঘটা কবিযা বিগ্রহস্নান করাইতেছ। একবাব চক্ষু মেলিয়া দেখ—যিনি বিশ্বরূপ তিনি কিরূপে স্নান করিতেছেন। আকাশ ঘননীবদনীল—দিঙ্‌মণ্ডল শ্যামায়মান—চতুর্দিকে ঘোর ঘটা। কখনও বা বজ্রেব ভৈবব রোল, কখনও বা বিজলীর হাসি। তোমাব চন্দ্রাতপ ঢাকঢোল আলোকমালা এই গম্ভীর শোভার কাছে কী তুচ্ছ! আব দেখ কী বিরাট স্নান! দরদর করিয়া মুষলধারে বর্ষা নামিল। আতপতাপিত বসুন্ধবা স্নিগ্ধ হইল— বিশ্বপ্রাণ জুড়াইল। ঐ দেখ, শ্যামসুন্দব বল্লবীবেষ্টন তরুবর স্নান করিয়া ফুল্লদোলে বিধূনিত হইতেছে। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে স্বয়ং সৎস্বরূপ মায়ামযী শ্যামা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া স্নানবিলাস করিতেছেন। আবও উপরে উঠ। ঐ যে নীরদ নীলিমা—উহাও তোমার জীবিতেশের রূপ। আর ঐ যে বর্ষা উহাও সেই প্রেমিকের ছল। সবই একাকার। অরূপ আজ শ্যামরূপ ধরিয়াছেন—শ্যামঘন—শ্যামময়—শ্যামপ্রকৃতি।

আজ স্নানযাত্রার দিনে ভেদ ভুলিয়া যাও। অসীম অম্বর হইতে ঝরঝর ধারা পড়িতেছে—বিপুল ভূমণ্ডল অভিষিক্ত হইতেছে। ভাল করিয়া বুঝিলে জানিতে পারিবে যে ইহা বিশ্বরূপের স্নানযাত্রা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি এত বড় বিরাট স্নান—যদি ভেদাভেদ নাই—তবে আর একটি ছোট বিগ্রহকে স্নান করান কেন। আমরা নাকি বড় ছোট তাই ছোট; নহিলে প্রাণটা পূর্ণ হয় না—আর প্রাণটা না ভরিয়া উঠিলে অনন্তের

পূর্ণতা ধরিতে পারি না—শূন্যতায় পড়িয়া মরিয়া যাই। কিন্তু ঐ ছোট বিগ্রহস্থানে যদি তুমি বিশ্বরূপের আনন্দবিলাস না দেখিতে পাও—তুমি প্রবৃত্তির দাস হইয়া চিরকালই কর্মের ভেদচক্রে ঘুরপাক খাইবে। যে মুহূর্তে ছোটর ভিতরে বড় দেখিবে সেই মুহূর্তে তোমার মুক্তির পথ খুলিবে।

হায় বঙ্গদেশ—তোমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তুমি আজ অভেদ মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া ভেদবাদের খুঁটিনাটিতে মজিয়া গিয়াছ। আজ স্নানযাত্রার দিনে দেবাদিদেব জগন্নাথের অভেদলীলাবিলাস দেখিয়া তোমার প্রাণ যেন প্রেমে মাতিয়া উঠে।

রথ-যাত্রা

ইংরেজী পড়িয়া কি বিপদই হইয়াছে। সমস্ত রসকষ শুকাইয়া গিয়াছে। এখন আর রথদোল ভাল লাগে না। ফুটবল ব্যাটবল থিয়েটার—এই সব ভাল লাগে, আর পালপর্বমেলা সব অশিক্ষিত ছোটলোকের কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

কাল মঙ্গলবার রথ-যাত্রা। ছেলেমেয়েরা আনন্দে মাতিবে ও ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে সংসার-রথের সারথি জগন্নাথদেবের জয়ধ্বনি করিবে। কাল রথতলার আনন্দবাজারে কী ঘটা কী বাহার—কী সুখসমাগম! গ্রামগ্রামান্তর হইতে অসংখ্য পুরুষনারী আসিয়া মায়াধীশকে দর্শন করিবে ও সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য কত কি জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সভ্যসম্প্রদায়ের এসব কিছুতেই মন ভিজে না। তাঁহারা কেবল বলেন—কে ওখানে লোকের ভিড় ঠেলে ধুলাকাদা খেয়ে রথ দেখিতে যাইবে। আর মেলার যে শ্রী—কতকগুলা তেলেভাজা পাঁপর-কচুরি ও পেতে চুপড়ি মাদুর খোরা পাথরবাটি বিক্রি হয়। আর ভদ্রলোকে

কি ওখানে যেতে পারে—যত লম্পট ও গণিকার আড্ডা বই ত নয়! এই সভ্য বাবুদের ইংরেজি পড়িয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সহিত সব মর্মবন্ধন টুটিয়া গিয়াছে।

তাঁহারা এখন ইংরেজিভাবে উৎসব মেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বক্তৃতা ও করতল চটচটা ধ্বনির চোটে আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিদেশী বিদ্যা পড়িয়া স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। ঐ বিভ্রম সংশোধনের জন্যই দুই একটা কথা বলার প্রয়োজন।

আমাদের শরীর একটি জীবন্ত রথ। সর্বসাক্ষী সর্বান্তর্যামী সর্বনিয়ন্তা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই রথের রথী। কর্মচক্রে ইহা তাড়িত ঘূর্ণিত চালিত হইতেছে। হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যেরূপ নিয়োগ করিতেছেন সেইরূপই ইহা চলিতেছে। আবার একটি একটি করিয়া সকল শরীর গ্রহণ করিলে সমগ্র মানবসমাজ এক প্রকাণ্ড রথের ন্যায় প্রতীত হইবে। আরও যদি আয়তন বৃদ্ধি করিয়া জড়চেতন যক্ষরক্ষঃ কিন্নরগন্ধর্ব দেবগণকে লওয়া যায় তাহা হইলে চতুর্দশ-ভুবনব্যাপী এক অনির্বচনীয় সুবিশাল রথ বুদ্ধিগোচর হইবে। শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব জগন্নাথ এই বিশ্বরথের রথী। ঐ যে ভৈরব বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পাইতেছ—ঐ যে মলয়ানিলের মৃদুমন্দ ঝুর ঝুর শব্দ—ঐ যে মধুমাখা প্রেমালাপ—উহা সমস্তই ঐ রথচক্রের গতি নির্দেশ করিতেছে। ঐ যে করুণাময়ী জননী সুকুমার শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন—ঐ যে দস্যু সেই শিশুকেই কাঞ্চনলোভে হত্যা করিতেছে—ঐ যে রণডাকিনীরা নরশোণিত পান করিতেছে ও হুহুঙ্কার রবে তাণ্ডবনাচ নাচিতেছে—ঐ যে দাতা লক্ষ লক্ষ অনাথকে অন্নদান করিতেছে—এই সব ভালমন্দ পাপপুণ্য শুভঅশুভ জীবনমরণ সুখদুঃখ—সেই বিশ্বরথীর নিয়োগেই হইতেছে। তাঁহার হাতে রাশ—সাধ্য কি যে রথ বা কর্মচক্র তাঁহার রাশের টান না মানে। কোথাও কোন সময়ে একচুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই। ঠিক রাশমাফিক চলিতেই হইবে।

তবে কি ভাল মন্দ নাই? কেন—যাহা ভাল তাহা ভাল, যাহা মন্দ তাহা মন্দ। মানুষ যেই মনে করে যে সে কর্তা—অমনি সে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। দ্বন্দ্ব কি—ভালমন্দ পাপপুণ্য হাসিকান্না সুখদুঃখ। যে নিজেকে কর্তা মনে করে, সে কর্ম উপার্জন করিবেই করিবে। আর কর্ম উপার্জন করিলে ফলভোগ করিতেই হইবে। এই ভোগ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া হয়। কর্তৃত্ববোধ থাকিতে এই দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া যায় না। কিন্তু মানুষ যদি একবার মায়াধীশকে দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে যে তিনিই একমাত্র কর্তা—তাহার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই—সে মুক্তির পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। রথের রথী মায়াধীশকে দেখিলে আর সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে হা-হতোস্মি করিতে হয় না। সকলকেই কর্মচক্রে পিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু যে জানে যে ঐ চাকা জগন্নাথের চাকা—সে 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া ঐ দ্বন্দ্ববিরোধ আনন্দের সহিত সহ্য করে, আর যে রথের রথী মায়াধীশকে জানে না—নিজেকেই কেবল কর্তা মনে করে—সে চাকার তলায় পড়িয়া গেলুম মলুম বলিয়া আর্তনাদ করে। এই সুগভীর তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্যই রথ-যাত্রা।

এস, আজ রথ দেখিতে যাই। আমাদের ছোট মন, ছোট বুদ্ধি। এস ঐ ছোটরথে বিশ্বরথ আরোপ করি, আর ঐ ছোট জগন্নাথটিকে দেখিয়া বিশ্বনাথের ধ্যান করি। ছোট রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া একবার সংসার রথ ও কর্মচক্রের কথা ভাবি। এই রথ দেখিয়া যেন বুঝিতে পারি যে যিনি বিশ্বনিয়ন্তা তিনি এই বিশ্বরথের চালক। প্রেমের চোখে রথ দেখ ও জগন্নাথদেবের দর্শন কর, আর বল—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

৮ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা

এস মা বরদে—এস আজ শারদীয় পূর্ণিমায় তোমায় বরণ করি।

আজ কোজাগর। পুরাণে লিখিত আছে—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥

আজ মা নিশীথে ভক্তের গৃহে আসিয়া বলিবেন—কে জাগিয়া আছ—কে পাশা খেলিতেছ—তাহাকেই আমি বরদান করিব।

সংসারটা ঠিক পাশাখেলা। এই ঘুঁটি পাকে পাকে, আর অমনি মারা যায়। আর এক চাল, তাহা হইলেই জিত—ও মা! কোথা থেকে আমার টক্‌টকে পাকা ঘুঁটিটি গাদে পড়িল, আর খেলা কাঁচিয়া গেল। একেবারে মুখে কালি চুন। আবার ওদিকে কখন বা কেবল পোহাবারো আর আঠারো—দেখিতে না দেখিতে বাজিমাৎ।

সংসারে কেবল জিত হয় না—হার-জিত আছেই আছে। আবার বাড়া ভাতে ছাইও পড়ে। চঞ্চল আশা—সুখদুঃখের বাসা—সংসারটা যেন পাশার তামাশা।

মা কমলা বড়ই চঞ্চলা। এই পোয়া এই কচ—এই পূর্ণ এই শূন্য, এই পাকা এই কাঁচা, এই উঠ্‌তি এই পড়্‌তি। মায়ের এই চঞ্চলতার হেঁচকা টানে যে কাতর হয় না তাহাকেই মা লক্ষ্মী অক্ষয় বর প্রদান করেন। যে সম্পদে-বিপদে আশায়-নিরাশায় পুরুষকার ছাড়িয়া দেয় না—যে শোকমোহের নিশীথেও জাগ্রত থাকে—অবসন্ন হয় না—সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র। পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

পুরাণে আরও লেখা আছে—

নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৄন্ দেবান্ সমর্চয়েৎ।
বন্ধূংশ্চ প্রীণয়েত্তেন স্বয়ং তদশনো ভবেৎ॥

কোজাগর পূর্ণিমায় নারিকেল ও চিঁড়ার দ্বারা পিতৃপুরুষ ও দেবতাদিগের অর্চনা করিবে বন্ধুবান্ধবকে তৃপ্ত করিবে ও স্বয়ং উহা ভোজন করিবে।

ইহার কারণ কি ? শাস্ত্রকথা ছাড়িয়া সহজ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

অন্ন লক্ষ্মী। যদি চঞ্চলাকে স্থিব করিযা রাখিতে চাও তো অন্নের যে রূপটি অধিক দিন স্থায়ী তাহাবই ভজনা কর। চিপিটকের (চিঁড়া) মত অন্নের স্থায়ী পবিণাম আর কি আছে। দূরগামী যাত্রীর চিঁড়াই প্রধান সম্বল। তাই কোজাগর পূর্ণিমায় অন্নের অন্য সব পাক ছাড়িয়া চিঁড়ার চলন। ফল—মানুষের ভাগ্যের নিদর্শন। আর যে সুমিষ্ট সুরসাল ফলের সার শ্বেতবর্ণ তাহা ত মূর্তিমান সৌভাগ্য। নারিকেলের মত অটুট ও স্থায়ী ফল তো দেখা যায় না। উহা আবার সহজে কেহ ভাঙিতে পারে না। আর কোনও ফল নারিকেলের মত অত দিন রাখা যায় না। সেইজন্যই কোজাগর রাত্রিতে নারিকেলের ব্যবহার।

যদি চঞ্চলাকে স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় বাঁধিয়া রাখিতে চাও, তাহা হইলে শাবদীয় পূর্ণিমায় মা লক্ষ্মীর পূজা করিও—পাশা খেলিয়া রাত্রি জাগরণ করিও, সংসারের সুখদুঃখের খেলায় সজাগ থাকিও—অবসন্ন হইও না। আর যাহাতে অন্নের সংস্থান, সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় অটুট হয় তাহার জন্য নারিকেল চিঁড়া খাইয়া মা লক্ষ্মীর অর্চনা করিও।

শিব-চতুর্দ্দশী

যে পূজা বেদে নাই—সে পূজা পূজাই নয়। বেদে কি শিবপূজা আছে? বেদে যদি কোন পূজা থাকে তো শিবপূজাই আছে।

যজুর্বেদে লিখিত আছে—নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ। হে রুদ্র—তুমি বিরূপ—তুমি বিশ্বরূপ—তোমাকে আমাদের নমস্কার। বিরূপ বলিলে বিকৃত রূপ বুঝায়। অন্ধ খঞ্জ নগ্ন মুণ্ড—সকল রূপই শিব। আবার তিনি বিশ্বরূপ—স্থাবর জঙ্গম চরাচর রূপ তিনি স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছেন। পুরাণেও তাঁহার অষ্টমূর্ত্তির কথা আছে। তিনিই সূর্য চন্দ্র অগ্নি জল পৃথিবী বায়ু আকাশ ও দীক্ষিত ব্রাহ্মণ—তিনি বিশ্বময়। ইহাই চরম জ্ঞানের কথা।

আমরা কিন্তু অজ্ঞান—আমাদের নিকট তিনি দুই রূপে প্রকাশ পান। বেদেও তাঁহার দুই প্রকার তনুর কথা বর্ণিত আছে—ঘোরা ও অঘোরা। তাঁহার ঘোররূপ কোপময় উগ্র ভীম—ধনুর্বাণসমন্বিত। বিরোধীদিগকে তিনি বিনাশ করেন। যাহারা শিবনিন্দা করে—তাহাদের সকল পূজা—সকল যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম তিনি লণ্ডভণ্ড করিয়া দেন। সংসারে ঘোর শিবনিন্দা হইয়াছে। কিছুতেই রক্ষা নাই। সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। ভূতনাথ এখনই সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। তুমি মনে করিয়াছ—সুখের ঘর গড়িয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে—মহামায়ার পূজা করিয়া ঐশ্বর্যবান্ হইবে। কিন্তু তুমি একনাথ মহাদেবের সমাদর কর নাই। তোমাকে কোন দেবতাই রক্ষা করিতে পারিবে না। স্বয়ং মহামায়া তোমার গৃহ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া যাইবেন। তুমি গণনাথকে অবমাননা করিয়াছ। তাঁহার নন্দীভৃঙ্গী তালবেতালেরা তোমার সাধের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তুমি অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া আছ—তাই তাহাদের অট্টহাস্যরোল—তাহাদের ডমরু শিঙ্গার ভীষণ ধ্বনি তুমি শুনিতে

পাইতেছ না। তুমি আনন্দ উৎসবে মাতিযাছ বটে, মহাকাল তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন—তাঁহার কালভৈরবেরা এখনই তালে তালে প্রলয়ের নৃত্য নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুমি মনে করিয়াছ দক্ষযজ্ঞ কবে একবার হইয়া গিয়াছে। তাহা নহে। তুমিও দক্ষের ন্যায় শিবদ্রোহী। তোমার ঘরে আবার দক্ষযজ্ঞের পালা হইবে। তোমার ধাবণা—দুর্গতিনাশিনী দুর্গার শক্তিতে তুমি শক্তিমান্—তুমি অন্যান্য দেবতার পূজা কর। কিছুতেই রক্ষা নাই। একনাথ মহাদেবের অবমাননা করিলে স্বয়ং ব্রহ্মাও তোমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না। আর যে মায়াশক্তির আশ্রয় লইয়া তুমি অহঙ্কার করিতেছ—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসংহারিণী—তাঁহাকেই মহাদেব সংহার করিয়া ফেলেন। মহামায়া অসুরনাশিনী—কিন্তু মহাদেব সুরাসুর সকলকেই বিনাশ করেন। সেই আদ্যাশক্তি—যিনি সংসাবভেদের মুল—তিনিও তাঁহার হস্তে রক্ষা পান না।

তুমি যখন শিবনিন্দা করিয়া ভেদচক্রে পড়িয়াছ—তখন মহাদেব তোমাকে সংহার করিবেনই করিবেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুঞ্জয়—তিনি সংহার করেন—সংহরণ করিবার জন্য। তিনি ভেদবীজ ধ্বংস করিয়া অভেদ অদ্বৈত স্থাপন করেন। তাই সংহারকর্তা হইয়াও তিনি শিব। এই তত্ত্বই আমাদের একমাত্র আশাস্থল। এই আশাতেই বুক বাঁধিয়া আমরা ভূতনাথকে আশুতোষ বলিয়া পূজা করি। তাহা না হইলে কাহার সাধ্য যে ঐ ঘোর রুদ্ররূপের সম্মুখে কেহ দাঁড়ায়।

শিবচতুর্দশীর দিনে কালের কাল মহাদেবের পূজা করিতে হইবে। ঐ কালনিশায় সংসার-শ্মশানে তাঁহার ঘোররূপ দেখ। তাঁহার উর্ধ্বনয়ন হইতে কোটি সূর্যের তেজের ন্যায় সংহারকোপের জ্বালা বাহির হইতেছে। তাঁহার ভূতগণ অট্টরোল তুলিয়া ভীষণ রঙ্গভঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আর স্বয়ং মহামায়া নৃত্যকালী রূপ ধরিয়া অসিহস্তে নৃত্য করিতেছেন ও জয়া বিজয়া—আর কত ডাকিনী যোগিনী মুণ্ডমালিনীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ভয় পাইও না—ঐ যে

রুদ্রের ঘোররূপ দেখিতেছ—উহার অন্তরে শান্ত অঘোর অদ্বৈতরূপ লুক্কায়িত আছে।

এই শুভদিনে সংযম উপবাস কর—সংসারকে শ্মশান করিয়া দেখ—অমানিশাকে কালরাত্রি মনে কর—আর ভূতগণের সঙ্গে কালঘণ্টার নিনাদ রটাইয়া ববম্ ববম্ রোল তোল—আর শিবোঽহং শিবোঽহম্ মন্ত্রে মহাদেবের পূজা কর। দেখ—বেদের কথা ভুলিও না। মহাদেবের দুই রূপ—ঘোর ও অঘোর।

যা ত ইষু শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো রুদ্র মৃড়য়॥

হে রুদ্র, তোমার বাণ শিবতম হউক—তোমার ধনু শান্ত হউক—তোমার তূণীর মঙ্গলপ্রদ হউক। এই ধনুর্বাণ ও তূণীরের দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।

এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ভোলানাথের পূজা কর। তিনি আশুতোষ, তিনি ঘোররূপ ছাড়িয়া শান্তরূপ ধরিবেন। তিনি ভেদবিনাশের ভিতরে অমৃতপথ দেখাইয়া দিবেন—তোমার শিবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

দোল-লীলা

জ্ঞান স্থির ও গম্ভীর—প্রেম চঞ্চল ও মধুর। যোগে হৃদয় স্পন্দহীন হয় কিন্তু প্রেমের আবেগে হিয়া দুরু দুরু কাঁপে—মৃদু মৃদু দোলে। যোগের ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন কিন্তু ভক্তের ভগবান্ প্রেমাকর্ষণচঞ্চল, হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়া দোললীলা করেন। জ্ঞানবলে পরমভাবের ভাবুক হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করা যায়, আবার প্রেমডোরে শ্রীহরিকে বাঁধিয়া আনিয়া ভক্তভাবের ভাবুক করা যায়। আমি যদি কাঁদি তো আমার হরি কাঁদেন—আমি যদি হাসি তো তিনি হাসেন—আমি যদি রাগ করি তো তিনিও রাগ করেন। ভাবের হিল্লোলে আমার মন দোলে

আর মনদোলায় বসিয়া আমার মনের মানুষ দোলেন। যিনি অসঙ্গ তিনি আবার সঙ্গের সঙ্গী—যিনি মনের অগোচর তিনি আবার মানুষ—যিনি অচল অটল তিনি চঞ্চল—যাঁহার চরণে কোটি ব্রহ্মাণ্ড দোলে তিনি আজ প্রেমের টানে দোদুল্যমান। অদ্ভুত দোললীলা অদ্ভুত রহস্য।

শ্রীহরি যে কেবল ভাবের দোলায় খেলা করেন তাহা নহে—তিনি সোহাগের বিবিধ রঙে রঞ্জিত হন। বেদান্তে বলে যে সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি অরূপ অবর্ণ। কিন্তু আমার মন বুঝে না। অরূপের নিকটে যাইলে অরূপ হইয়া লীন হইতে হয়। তাই অরূপে রূপ দেখিতে প্রাণ বড়ই আকুল। যদ্রূপ বর্ণরহিত অনন্ত দিগন্ত নীলিমা-রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়—আবার সেই নীলিমা অরুণরাগে লোহিতরূপ ধারণ করে—তদ্রূপ অদৃশ্য অবর্ণ ঈশ্বর প্রেমকুঙ্কুমে রঙীন হইয়া প্রকাশিত হন। সব লালে লাল—যিনি মহান্ তিনি আবার প্রেমদুলাল। শান্ত সমাহিত ভাব চলিয়া গিয়াছে—লাল রঙে প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে। ভক্তের ভালবাসা শ্রীহরিকে রক্তাভ করিয়া তুলিয়াছে—আর ভাবের উচ্ছ্বাসে আবার মুখশ্রীও রক্তিম হইয়াছে। রঙে রঙে মিশিয়া গিয়াছে। মনকে যে রঙে রঞ্জিত করিবে শ্রীহরিও সেই রঙ্গে রঙীন হইবেন। তুমি যদি কালো হও—ঠাকুরও কালো হইবেন। তুমি যদি মঙ্গল-হরিদ্রা মাখ, তিনিও পীতবসন পরিয়া তোমার নিকটে আসিবেন—তোমার যদি নিবৃত্তির নীলিমা ভাল লাগে, তিনিও নীলকলেবর হইয়া উপস্থিত হইবেন।

এই দোললীলা বিশ্ব ব্যাপিয়া চলিতেছে। ধরাধামে নববসন্ত-সমাগমে এই লীলার বিশেষ ঘটা হয়। গ্রীষ্মের অসাড়তা নাই—বর্ষার ঝটিকা নাই—শীতের হিমপাত নাই। আবার দিক্ সকল নির্মল ও আনন্দময়। কোথা হইতে ধীর সমীরণ ঝুরু ঝুরু বহিয়া আসিতেছে আর প্রকৃতিকে দুরু দুরু বিধূনিত করিতেছে। ঐ যে সরসী লহরী তুলিয়া নাচিতেছে আর বিকশিত কমলদলকে নাচাইতেছে উহা শ্রীহরির দোলা। তিনি ঐ লহরীবিকম্পিত কমলদোলায়

শ্রীচরণকমল রাখিয়া দুলিতেছেন। ঐ যে বল্লরীবিজড়িত নবপল্লবিত কুসুমপরিপূরিত তরুবর অনিলস্পর্শে মৃদুমন্দ দুলিতেছে—উহাতে তিনিই দোলায়মান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃতি হাসে আর দোলে—প্রকৃতির ঠাকুরও হাসে আর দোলে। আবার এই বসন্তে মধুর শ্যামরক্তিমা স্বভাবকে আচ্ছাদন করিয়াছে। আমার ইষ্টদেবতাও নবপল্লবদল শ্যামরূপ ধরিয়া প্রেমিকের মনমোহন করিতেছেন। কুঞ্জে কুঞ্জে মালঞ্চে মালঞ্চে কতই না লালের খেলা—ও যে আমার ঠাকুরের রঙ্গলীলা।

এস, আমরাও প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতির ঈশ্বরের সঙ্গে দোল দেখি। যে ঈশ্বরকে দোলাইতে জানে না, যে তাঁহাকে রঙ মাখাইতে জানে না—সে ভক্ত নহে—সে প্রেমিক নহে। তাঁহার ভাবের ভাবুক হইলে সাগরের জল সাগরে মিশিয়া যাইবে। তাই তাঁহাকে আমার ভাবের ভাবুক করিয়া মনোদোলায় দোলাইতে হইবে। আমার হাসিকান্নায় তাঁহাকে চঞ্চল করিব। আর অরূপকেই বা কিরূপে ভালবাসি। তাই প্রেমের রঙে তাঁহাকে রঙ্গাইয়া মাতোয়ারা হইব।

দে দোল দে দোল—আজ প্রকৃতি তাহার দেবতাকে দোলাইতেছে। আমিও এই দোলপূর্ণিমায় আমার অচল অটল অরূপ ঠাকুরকে হৃদয়দোলায় বসাইয়া দোলাইব ও প্রেমের ফাগে—প্রকৃতির লাল রঙে—ভক্ত ভগবান্ দোহে লালে লাল হইয়া যাইব। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে যে যে রূপে চাহে তিনি সেই রূপ ধরিয়া দেখা দেন। প্রেমের অনুরোধে অপরূপ রূপবান্ হন—অচল চঞ্চল হইয়া দোলেন।

পদ্ম-পুরাণে বলিয়াছেন—

দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলায়নং সকৃন্নরাঃ।
দৃষ্ট্বাপরাধনিচয়ৈ র্মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ।

অর্থাৎ দোলে দোলায়মান দক্ষিণমুখ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে একবার দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে জনগণ সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হয়।

জৈমিনি বলিয়াছেন—

ফাল্গুনে মাসি কুর্বীত দোলারোহণমুত্তমং
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ।

অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে উত্তম দোলে আরোহণ করিবে, যেখানে ভগবান্ গোবিন্দ লোককে অনুগ্রহ করিবার জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

এই রূপে দোললীলার বিষয় কি পদ্মপুরাণে কি গরুড়পুরাণে, কি স্কন্দপুরাণে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

উদ্বোধন

সখা, বন্ধু, মিত্র, গুরু, দেবতা—আমাদের সর্বস্ব, যখন আসিয়াছে তখন যুগান্তরে যেমন পার্থ সারথি হইয়া—

পবিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি আজ আমাদের বড় সাধের মনোরথের সারথিরূপে আসীন হইয়া, সংসার-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উহাকে পরিচালিত কর। মাঝে মাঝে তোমার পাঞ্চজন্যের ভীমরোলে আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব—মহাহবে তোমার আশ্বাস পাইয়া মহাবীরের ন্যায় রিপুদমনে প্রবৃত্ত হইব। দ্বাপরের শেষে এক ধনঞ্জয়ের রথচালনা করিয়াছিলে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় এক তুমি বহু হইয়া, মহান্ তুমি অণুরূপে কোট্যাংশে বিভক্ত হইয়া আমাদের সকলের মনোরথ পরিচালিত কর। প্রতি রথে ছয়টি করিয়া অশ্ব জোড়া আছে—দুর্দমনীয় হয়-চয় কেবল তোমারই বল্গা-সঙ্কেতে নির্দিষ্ট পথে চলিবে। তাই দয়াময়, আজ বাঙলার তথা ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারী করজোড়ে, অবনত মস্তকে তোমায় আহ্বান করিতেছে। হে মধুমুর-

নরকবিনাশন, হে কেশিকালীয়মর্দন, হে মদনমথনমনোমোহন কংসারি, ভারত-দুঃখহারী—আজ তোমায় কাতরকণ্ঠে আমরা ডাকিতেছি—তুমি দেখা দাও—আমাদের শ্রদ্ধার আসনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। তুমি না রাখিলে আমাদের কে রাখিবে—তুমি দুর্বলের বল—পতিতের উদ্ধারকর্তা।

যে আবর্জনায় সমাজ-প্রাঙ্গণ অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে, যে মলিন ছায়ায় সমাজ-গৃহ অস্পৃশ্য—অব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে—আমরা সেই আবর্জনা দূর করিতে চাই—আমরা সেই ছায়া অপসারিত করিতে চাই—বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপানিধান, আমাদের বাসনা পূর্ণ কর। বিদেশী বর্জন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—বিদেশীর ছায়া মাড়াইব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি—আমার আঙ্গিনায় মহালক্ষ্মীর পূজার উদ্দেশ্যে শুভ আলেপন দিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। দেবতা তুমি—সর্বস্ব তুমি—শক্তিময় তুমি—এমন শক্তি দাও যাহাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়; আমাদের সঙ্কল্প বজায় থাকে—আমাদের অঙ্গনে মায়ের চরণ-লেখা-মালা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

শুভ ত্রয়োদশী তিথিতে মঙ্গলের ঊষায় বুধোদয়ে সেই প্রতিজ্ঞার—সেই সঙ্কল্পের বার্ষিক মহোৎসব করিব। স্বয়ং ভগবান্ যে উৎসবের অধিষ্ঠাতা—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে উৎসব-ক্ষেত্রে সারথি। উঠ ভাই বাঙালী—তোমার চিরকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মী, তোমার শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলি-ধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ গ্রামের গ্রাম্যদেবতাগণ—তোমাদের নিজ নিজ গ্রামে সদ্ভাবের—স্বদেশীয়তার পুণ্যপ্রবাহ আবার ছুটাইয়া দাও। দেখ, দেখ ভারতের ভাগ্যবিধাতা সবিতৃদেবতা—তোমার করুণার কোটি কিরণজাল বিস্তার করিয়া আমাদের উৎসব দেখ। ইহাই উদ্বোধন—মৃতসঞ্জীবন। অহল্যার পাষাণ-উদ্ধার এদেশে আর হয় নাই—একবার বিলাসমুগ্ধা অহল্যার পাষাণত্বের ক্ষালন হইয়াছিল—আর বিলাতী-বিলাস-মুগ্ধ পাষাণময়

আমাদেরও বুঝি বা এতদিনে ভগবচ্চরণসরোজ-সংস্পর্শে পাষাণত্বের অপচয় হয়। আয় বাঙালী—ভাই ভগ্নী পুত্র কন্যা পিতা মাতা—বৃদ্ধ যুবা বালক বালিকা—আয় সবে আজ সকলে সম্মিলিত হইয়া সেই অপূর্ব স্পর্শ-সুখ অনুভব করি, যাহাতে আর আমাদের পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে না। আমরা সজীব হইলে, পাষাণী ঈশানী মা আমাদের শক্তিধারিণী হইবেন, আমাদের দুঃখ দূর হইবে—সকল জ্বালা জুড়াইবে।

দেশের আহ্বান—মায়ের আহ্বান মহামুহূর্তে মহাসম্মিলনে সকলেই সম্মিলিত হও,—দয়াময়ের দয়া অবশ্যই আমাদের মাথায় বর্ষিত হইবে।

বন্দে মাতরম্

আমার ভারত উদ্ধার

আমার ভারত উদ্ধার

যখন আমার বয়স চৌদ্দ পনরো, তখন সুরেন বাঁড়ুজ্যে একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ করেন। কালী বাঁড়ুজ্যে, আনন্দমোহন বসুও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। লেকচারে লেকচারে দেশ মাতিয়া উঠিল। আমার ত খাওয়া-দাওয়া নাই; শ্যামের বাঁশী শুনিয়া যেমন গোপীজন উন্মত্ত—আমিও তদ্বৎ। আমার পিতামহী বলিতেন—নেকচারেই দেশটাকে খেলে।

লেকচার না শুনিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত—কিন্তু লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া যখন বাড়ি ফিরিতাম তখন মনে হইত—প্রাণটা যেন খালি খালি—ভরে নাই। এই রকমে বৎসর দুই কাটিয়া গেল—এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া কালেজে উঠিলাম। তখন বয়স সতরো বৎসর। ঐ কাঁচা বয়সে প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করিতে লাগিল। সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে ভারত উদ্ধার করা—কিছুতেই পোষাইবে না—মনে হইতে লাগিল। ছেলেমানুষ—সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে মনে মিলে না—বলিলেই ত লোকে জ্যাঠা বলিয়া উড়াইয়া দিত। একদিন প্রাণের আবেগে ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি তখন মট্‌স লেনে রাজা শ্রীযুত সুবোধ মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাটিতে থাকিতেন। তিনি আমায় চিনিতেন না। কিন্তু আমার পিতৃব্যদেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু বলিয়া—আমার সহিত তিনি খুব হৃদয় খুলিয়া কথা কহিলেন। পরিচয়ের পরই আমি তাঁহাকে হুম্ করিয়া বলিলাম—Not through pen but through sword—অর্থাৎ কলমবাজিতে হইবে না, তলোয়ারবাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে। প্রথমে তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন—চুপ চুপ্—ঐ যে—উনি সরকারী কর্মচারী বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর ভগবানবাবু ডেপুটী সেইখানে বসিয়াছিলেন। তারপর তিনি ধীরে

ধীরে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে মানবজাতি আর তত বর্বর নাই—এখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে—বিশেষতঃ ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার দূতস্বরূপ (apostle)—তাই এ কালে বৈধ আন্দোলনই (constitutional agitation) যথেষ্ট, পাশবশক্তি প্রয়োগের আর অবকাশ নাই।—আমি ত এই কথা শুনিয়াই অস্থির হইয়া উঠিলাম। যত শীঘ্র পারিলাম বিদায় লইয়া বাটী আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম —কি করি, কোথায় যাই ?

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া—জল্পনা কল্পনা করিয়া স্থির করিলাম, —গোয়ালিয়রে গিয়া সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব। চারিজন বন্ধু জুটিলাম। আমার টাকাকড়ি কিছুই ছিল না। দুই মাসের কালেজের মাহিনা মাত্র দশ টাকা সম্বল। আর তিনজন বন্ধুরও তথৈব চ, তবে আমার অপেক্ষা কিছু ভাল। ঐ অল্প টাকা লইয়া, বাড়ি হইতে পলাইয়া রেলে উঠিলাম। যা পয়সা ছিল তাহাতে ইটাওয়া ইস্টিশান পর্যন্ত চারিজনের যাওয়া চলে। ইটাওয়ায় অবতরণ করায় শুনা গেল যে, সেখান হইতে গোয়ালিয়র ছত্রিশ ক্রোশ দূর। প্রাণের আবেগ এত যে কোন বাধা-বিঘ্নতে মন দমে না। একরাত্রি ইটাওয়া থাকিয়া আমরা গোয়ালিয়র রওনা হইলাম। আমাদের—গোয়ালিয়র যাত্রার মত সুখের যাত্রা—আর কাহারও বোধ হয় কখনও কপালে হয় নাই।

গ্রীষ্মকাল—সকাল বেলা—পাঁচটা বাজিয়াছে। চারিজন বাঙালী যুবক—বয়স সতরো কি আঠারো ভারত উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে চারিটি কি পাঁচটি করিয়া টাকা আছে কিন্তু—মনে মনে সিংহবল। প্রথমেই যমুনা পার হইতে হইল। তার পরে অনেক দূর হাঁটিয়া গিয়া চম্বল নদী পাইলাম। চম্বল পার হইয়া আরও কিছু দূরে গিয়া—শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া—একটি বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। আমরা পরামর্শ করিলাম যে—দিনের বেলায় বিশ্রাম

করিব ও রাত্রিতে হাঁটিব। এইরূপ মনে করিয়া সেই গাছতলায় চারিজনে শুইয়া বসিয়া রহিলাম। সঙ্গে কিছু খাবার ছিল না—তেপান্তর মাঠ—বালি আর কণ্টক-গুল্মে ভরা। একটা বোতলে আধ পোয়াটাক ছোলা ভিজান ছিল—তাই চর্বণ করিয়া আত্মারামকে তৃপ্ত করিতে লাগিলাম। আর কিছু ছাতু ও গুড় ছিল—তাহাও কোন রকমে গলাধঃকরণ করিলাম। এইরূপে বসিয়া আছি—এমন সময় দেখি যে একদল হিন্দুস্থানী সেই পথ দিয়া যাইতেছে। উহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা কোথায় যাইবেন? আমরা বলিলাম—গোয়ালিয়র। সে বলিল—আমরা গোয়ালিয়র মহারাজের সিপাহী—ছুটির পর পুনরায় গোয়ালিয়র যাইতেছি—আসুন—আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা বলিলাম—বড় রৌদ্র, রাত্রিতে পথ চলিব। সে হাসিয়া বলিল—এ দেশে রাত্রিতে পথে ভয় আছে, দিনমানেই যাওয়া ভাল। এই কথা শুনিয়া আমরা তল্পিতল্পা লইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। রাস্তা আর ফুরায় না। সন্ধ্যা হইল- রাত্রি হইল—তবুও সিপাহীরা চলিতেছে; আর আমরা সিপাহী নহি—কিন্তু সিপাহী হইব—এই ভাবনায় ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সময়—সিপাহীরা বড রাস্তা ছাড়িয়া মাঠ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। আমাদের মনে শঙ্কা হইল -এরাই ত ডাকাত নয়। আমাদের মধ্যে আমি ও আর একজন কিছু বলশালী ছিলাম। আমরা দুইজন আগে আর আমাদের পিছনে—আর দুইজন বন্ধু রহিল। আমরা আর তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া চলিলাম না। একটু সরিয়া সরিয়া চলিতে লাগিলাম—খুব সতর্ক—যদি চড়াও করে ত আটক করিব। এইরূপ ভয়ে ভয়ে কিছুদূর গিয়া শেষে দেখি যে—সিপাহীরা একটি গ্রামে গিয়া পঁহুছিল। তখন আমাদের সকল শঙ্কা দূর হইল। দেখি যে এক প্রকাণ্ড কেল্লা—কেল্লার চতুর্দিকে ঐ গ্রামটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কী যোগাযোগ—কী আনন্দ! সঙ্গের সঙ্গী সিপাহী—আর আশ্রয় দুর্গতল। কোথায় গেল ভাবনা চিন্তা—

কোথায় গেল ভয়! ঠিক্ যেমন রণডঙ্কা শুনিয়া যুদ্ধের ঘোড়া তালে তালে পা ফেলে, সেই রকম প্রাণটাও তালে তালে নাচিয়া উঠিল।

বেল্লাটির নাম গোহদ। গ্রামের নামও গোহদ। গোহদে সে রাত্রিতে কিছুই পাওয়া গেল না—কেবল মহিষের দুধের ডেলা ক্ষীর। তাহাই কিছু কিছু খাইয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে হাত মুখ ধুইয়াই আবার রওয়ানা। বেলা দশটা আন্দাজ একটি গ্রামে পঁহুছিয়া স্নানাহারের যোগাড় করা গেল। সিপাহীরা খুব মোটা মোটা চপাটি আর একটু পুদিনার চাটনি দিল। উহাই ক্ষুধার চোটে খাইয়া আরাম করিতে লাগিলাম। আবার বেলা চারিটা না বাজিতে বাজিতে সিপাহীরা উঠিল। আমরাও তৈয়ার। আমাদের সঙ্গে একটি মুটিয়া তল্পিদার ছিল। সে বলিল যে, সে আর চলিতে পারে না। কাজেই তাহাকে বিদায় দিয়া, আমরা নিজেরা আমাদের মোট ঘাড়ে করিলাম। কী বাহার—কী বাহার! কবে এই বাঙলা দেশের সহস্র সহস্র যুবক তোজদান বন্দুক ঘাড়ে করিয়া রণক্ষেত্রে কুচ করিবে। ঐ মোট ঘাড়ে করিয়া বেগবতী পাহাড়িয়া নদী সকল পার হইলাম। অবশেষে সন্ধ্যা আসিল—চাঁদ উঠিল। ঝুব্ঝুর্ দক্ষিণে বাতাস—মাঠভরা জ্যোৎস্না—আবার মাঝে মাঝে বিলোল কটাক্ষ হরিণের পাল—প্রাণে কি আর প্রাণ থাকে। আমাদের মধ্যে একজন সুকণ্ঠগায়ক ছিলেন, তিনি গাহিলেন—

“কত কাল পরে বল ভারত রে
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।”

আমাদের আশার আগুন দশগুণ জ্বলিয়া উঠিল—মরমে মরমে বেদনার সাড় হইল। এই প্রকারে ছাতু চনা চপাটি খাইয়া—শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে আনন্দে বেদনায় আমরা অবশেষে গোয়ালিয়রে পঁহুছিলাম।

খাস গোয়ালিয়রকে লস্কর বলে। সিন্ধিয়া মহারাজের উহা রাজধানী। রাজধানীর এক ক্রোশের মধ্যেই ইংরেজের একটি ছাউনি

আছে। উহাকে বলে—মুরার। ঐ মুরারে গিয়া আমরা প্রথমে একটি সরায়ে নামি। তার পরদিন খবর পাইয়া বাঙালী বাবুরা একটি কালীবাড়িতে আমাদের বাসা করিয়া দেন। পাঁচ-সাত দিন সেইখানে থাকি ও লস্করে যাতায়াত করি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজনের পিতা আসিয়া উপস্থিত। তিনি একজন পুলিশ বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। কেমন করিয়া যে তিনি খবর পাইলেন—তাই ভাবিয়া আমরা অবাক্। শেষে বুঝিলাম, আমরা আমাদের একজন বন্ধুকে দেশে চিঠি লিখিয়াছিলাম—সেই চিঠি ধরিয়া তিনি ঠিকানা বাহির করিয়াছেন। যাহা হউক আর নিস্তার নাই। আমিও আর একজন—ইংরেজের ছাউনি হইতে লস্করে পলাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমাদের বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে আমরা নাবালক—আমরা যেখানে যাই সেইখান হইতেই আমাদের ধরিয়া আনা হইবে। অগত্যা আমাদের অল্প বয়সকে ধিক্কার দিয়া পলাইবার আয়োজন বন্ধ করিলাম। আর তিন-চারি দিনের মধ্যেই দেশে ফিরিয়া আসিলাম। বাড়িতে আমাকে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি করিয়া দিল।

তখন বিদ্যাসাগর কলেজে সুরেনবাবু প্রোফেসার। তাঁর ইংরেজি পড়ানো শুনিবার জন্য কেলাসে ছেলে আর ধরে না—সকলেই উদ্‌গ্রীব—আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। মন এমনি খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে খুব সিদ্ধি খাইতে শুরু করিলাম। এত সিদ্ধি খাইতাম যে কালেজেও নেশার ঝোঁক যাইত না। আমার বেশ মনে আছে—একদিন সুরেনবাবু পড়াইতেছিলেন আর আমি বহির গাদা আড়াল দিয়া নিদ্রা দিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের পাঠ্যপুস্তকের কোন বিশেষ সংস্করণ দেখিবার জন্য সুরেনবাবুর প্রয়োজন হয়। ঐ সংস্করণ আমার কাছে ছিল। কে একজন বলিয়া দিল যে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। তখন সুরেনবাবু বলিলেন, আমি মানুষটিকে চাহি না—মানুষটির বইখানি চাই।—

ইহাতেই বুঝা যাইবে—আমার মনের গতিক কি রকম ছিল। তারপরে সিদ্ধি ছাড়িয়া দিলাম। সেই যে ছাড়িলাম আর কখনও খাই নাই। মনটাকে স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—আবার গোয়ালিয়র যাইব, যোদ্ধা হইব—সুরেন বাঁড়ুজ্যের বৈধ আন্দোলন ছাড়িয়া, তরবারির চমকে দিগ্‌দিগন্ত ঝলসাইয়া তুলিব—ফিরিঙ্গিকে চমকাইয়া দিব।

অনেকে বলিতে পারেন—ইহা যে বিদ্রোহের কথা, বলিলে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তা কি করিব। সুকুমার বয়সে যাহা আপনা আপনি মনে হইত—তাহা বলিলে যদি ফিরিঙ্গি ভয় পায় ও ভয় পাইয়া মানব-হৃদয়ের ইতিহাসকে চাপিয়া দিতে চায় ত দিক, তাহাতে কি ক্ষতি। সত্য চাপা দিতে গেলে নিজেই চাপা পড়িবে।

যাহা হউক আবার এক বৎসরের মধ্যে কালেজের পড়াশুনা ছাড়িয়া পুনরায় গোয়ালিয়র যাই। এ কথা বারান্তরে বলিব—অনেক মজার কথা আছে।

দুই

আমি বিদ্যাসাগরের কালেজে এফ-এ কেলাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। পড়া খুব ভাল হয়। সুরেন বাঁড়ুজ্যে, প্রসন্ন লাহিড়ী, নবীন পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়ান। কালেজ খুব জম্‌জমাট—আমার মন কেমন উধাও। সুরেন বাঁড়ুজ্যের লেকচার শুনিয়া—দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছি—নিজের ভাবনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা বড়ই মিষ্ট লাগে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে তাঁহার লেকচারে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—তোমাদের মধ্যে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি কে হবে?—আমরা উৎসাহে হাততালি দিয়া বলিতাম—সকলে সকলে (all all)। এমনি আমার প্রাণটা পুরিয়া উঠিয়াছিল যে আমি

মনে মনে স্থির করিলাম—বিবাহ করিব না—বি-এ, এম্-এ পাস করিব না—প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।

প্রাণের আবেগে কালেজ ছাড়িয়া আবার গোয়ালিয়রে গেলাম। এবার সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা ছিল। একেবারে আগ্রার টিকিট লইলাম। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর—উনিশে পড়ি পড়ি। চলিয়া যাইবার সময় একটু কষ্ট হইয়াছিল—চোখটা ভিজা ভিজা ঠেকিয়াছিল।

আগ্রায় পঁহুছিয়া তখনই ধোলপুরের টিকিট লইলাম। আগ্রায় আমার এক কাকা কাজ করিতেন—বড় ভয়, পাছে আমায় ধরিয়া ফেলেন। ধোলপুরে গিয়া উমাচরণবাবুর বাড়িতে নামিলাম। তিনি ধোলপুরের রাণার মাস্টার, সেখানে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি। তিনিই বুঝি পরে পণ্ডিতা রমাবাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, হাসিলেন—বোধ হয় পাগলাটে মনে করিলেন। যুদ্ধবিদ্যা শিখিব—দেশ স্বাধীন করিব—ও কি কথা! স্বাধীনতার কথা শুনিলে, আজ ত্রিশ বৎসর পরেও ভূপেন্দ্রবাবুর মত লোকেরা শুধু যে হাসেন তাহা নয়—ফিরিঙ্গিদের গাঁটছড়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাঁহারা বড়ই নারাজ। যাহা হউক পাগলাটে বলিয়া খাতির যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই। রাত্রিতে মটন রাঁধা হইল। তখন আমি মাছমাংস প্রায় পাঁচ বছর ছাড়িয়া দিয়াছি—মটন কি করিয়া খাই। কিন্তু খাইব না বলিতে বড়ই লজ্জা করিল। যুদ্ধ শিখিতে যাইতেছি—অথচ মাংস খাই না—দুয়ে যেন মিলে না। তাই লজ্জায় পড়িয়া পুরা বাটি পার করিলাম—আবার চাহিয়া লইলাম। খাইতে খাইতে পূর্বাস্বাদ জাগিয়া উঠিল—মন্দ লাগিল না। এই মাংস খাওয়ার পরে আর কখনও মাছমাংস খাই নাই। আর এখন বুড়া হইতে চলিলাম—বয়স সাতচল্লিশ হইয়াছে, মাংস খাবার লোভ আর নাই। সেই রাত্রিতে রাণার বাড়ি নাচ। উমাচরণ-বাবু আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আমি যাইলাম না।

মনে করিলাম—যে ভারত উদ্ধারের ভার লইয়াছে সে নাচ-তামাসা দেখে না।

ধোলপুর হইতে তখন গোয়ালিয়রে রেল হয় নাই। আঠার ক্রোশ রাস্তা—ঘোড়ার বা উটের গাড়িতে যাইতে হইত। ঘোড়ার গাড়ির অনেক ভাড়া—তাই আমি উটের গাড়িতে চড়িলাম। উটের গাড়িগুলি দোতলা। আমি উপর তলায় জায়গা লইলাম। রাত্রি দশটা আন্দাজ গাড়ি ছাড়িল। উটের জুড়ি ছুটিল,—গাড়িও বেগে চলিল—কিন্তু প্রাণ যায় যায়। এম্‌নি হেঁচ্‌কা টান যে দম বাহির হইয়া যায়। ভারত উদ্ধারের গোড়াতেই হেঁচ্‌কা টান। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সহিয়া গেল—উঠিয়া বসিলাম।

সেই উটের গাড়িতে বসিয়া বসিয়া আঠার বৎসরের বাঙালী যুবকের মনে কতই না আশার কল্পনা জাগিতে লাগিল। চম্বল নদী পার হইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য পড়িল। চারিদিকে বিজন প্রান্তর—মেটে মেটে পাহাড় ও গুল্মের ঝোপে পরিপূর্ণ। মনে হইতে লাগিল—কবে এই প্রান্তর মারাঠা অশ্বারোহীতে ছাইয়া পড়িবে, আর অশ্বারোহণে সেনাদল চালনা করিব। ঐ যে দূতেরা আসিয়া খবর দিল—শত্রুদল। তাদের বড় বড় কামান, তোপ লইয়া আসিতেছে। আমি অমনি পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে হুকুম দিলাম—রাস্তার এক মাইল দূরে লুকাইয়া থাকিয়া যেন পাহারা দেয়। শত্রুর চর দেখিলেই যেন তীরের দ্বারা তাহাকে ঘাল করে—বন্দুকের আওয়াজ না হয়। দুশমনেরা যেন মনে করে যে—প্রান্তরে জনপ্রাণীও নাই। আর এক হাজার সওয়ার লইয়া—পাঁচ শত পাঁচ শত করিয়া আগু-পিছু এক ক্রোশ ব্যবধানে ঘাঁটি বাঁধিলাম। আর আমি মাঝখানে এক সহস্র সেনা লইয়া আড্ডা গাড়িলাম। শত্রু আসিল—দুই হাজার বন্দুক, পাঁচ সাত শত সওয়ার—ছয়টা বড় বড় কামান। প্রথম ঘাঁটি তাহারা পার হইল। মাঝের ঘাঁটির কাছে যাই তোপখানা আসিল—অমনি কামানের ঘোড়া আর গোলন্দাজগুলা ধরাশায়ী। একটিও বেশী গুলি ছাড়িতে হইল না, যে

কয়টি ঘোড়া, আর যে কয়জন গোলন্দাজ, ততগুলি আওয়াজ হইল। একটি অধিক নয়—একটি কম নয়। তারপরে এক মিনিটের মধ্যেই একবারে গুলিবৃষ্টি—আগু-পিছু মাঝখান হইতে—একেবারে আগুন ছুটিতে লাগিল। তীরন্দাজরাও খুব কাজ করিল। যত বড় বড় পালকওয়ালা টুপি-পরা জাঁদরেলদের টুপ্ টুপ্ করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপরে—একেবারে রণ্ রণ্ ব্যাপার। সে যে তলোয়ারের চকমকানি—দুশমন একেবারে কচুকাটা হইয়া গেল। কল্পনায়—এই রকম কতই ছবি আঁকিতে লাগিলাম। এখনও উহা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এইরূপ মানস-সৃষ্টির আনন্দে উটের গাড়িতে বসিয়া চলিলাম; চোখে একটুও ঘুম নাই। তখন 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'বঙ্গবিজেতা'র কাহিনীতে মন ভরিয়াছিল। মনে হইতে লাগিল—যেন অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টিতে অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়া চলিতেছি—কত বিপদে পড়িতেছি, শত্রু নিপাত করিতেছি।—অনেক রকম ছবি দেখিলাম, তবে কোন তিলোত্তমা আবিষ্কার করি নাই বা কোন সরলাকে দেখিবার জন্য ঘাটে নৌকা লাগাই নাই। ঐটুকু কঠোরতা আমার ভারত উদ্ধারে আছে। ঐ নির্মমতা, এই বুড়া বয়সেও আমাকে ছাড়ে নাই।

শেষে প্রভাত হইল—নিদ্রা আসিল। একটু বেলা হইয়াছে আর চালক বলিল—উঠো, গোয়ালিয়র আগেয়া। ধড়মড়িয়া উঠিয়া আমি তল্পিতল্পা লইয়া নামিলাম—কোথায় যাইব ঠিক নাই। বাঙালী বাবুদের কাছে যাইব না—আগেই স্থির করিয়াছিলাম। গোয়ালিয়র শহরকে লস্কর বলে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। লস্করের বড় রাস্তা দিয়া আনমনে যাইতেছি, এমন সময় একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ—ভাঙ্গা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি চাকুরি করিবেন কি?—একজন সর্দারের ছেলেকে পড়াইতে হইবে। আমি বলিলাম—আপনার ত আমার সঙ্গে পরিচয় নাই, হঠাৎ এই প্রস্তাব কেন করিলেন? তিনি বলিলেন, পরিচয়ের প্রয়োজন নাই—বাঙালী

বাবুরা ভারি ইংরেজী জানে। আমি ত হাতে চাঁদ পাইলাম। তিনি তখনি আমাকে সর্দারের বাড়িতে লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি ও বাগান। চাকরে একটি গভীর ইঁদারা (কূপ) হইতে সুশীতল জল তুলিতেছে। প্রাণ ভরিয়া স্নান করিলাম ও বাজারে গিয়া পুরী, তরকারী, মিঠাই খাইয়া আসিলাম। পরে সর্দারের সঙ্গে দেখা হইল। ত্রিশ টাকা মাইনা ঠিক হইল। ছেলেটি বড় ছোট। কিন্তু একটি বড় কঠিন শর্ত আমার স্কন্ধে চাপানো হইল। বাটির বাহিরে যাইবার হুকুম নাই—কেবল ছেলেকে লইয়া বৈকালে বেড়াইতে যাইতে হইবে। দিন পাঁচ সাত কাজ করিলাম—সর্দার খুব খুশি। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইল। ভাবগতিকে বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার সঙ্গে মহারাজের বড় প্রীতি নাই। একটি জিনিস দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহার বাড়িতে অনেকগুলি মুর্গী চরে। এদিকে সর্দার সাহেব শিবপূজা করেন ও খুব ফোঁটা কাটেন। আমি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমরা যে যোদ্ধা। আমি ত অবাক্। পরে জানিলাম—ব্রাহ্মণেতর মারাঠারা মুর্গী খায়। সর্দারের বাড়িতে বেশ সুখ শান্তি বটে, কিন্তু আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। বন্দীর মত থাকা আমার অসহ্য হইল। সর্দারের কাজ ছাড়িয়া দিলাম। আমার প্রথম পরিচিত মারাঠী ব্রাহ্মণের সাহায্যে—শহরের একঘর ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় পাইলাম। এই গৃহস্থের নাম বলবন্ত রাও। বলবন্ত রাও রাজসরকারে মুন্সীর কাজ করেন—বয়স আন্দাজ পঁচিশ বৎসর। বাটীতে মা ঠাকরুন আছেন ও তাঁহার স্ত্রী—ছেলেপিলে নাই। ইনি ইংরেজি অল্প অল্প জানেন—আমার কাছে ইংরেজি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি এগার বৎসর ইংরেজি পড়িয়াছি শুনিয়া ইঁহারা আমাকে ইংরেজি সাহিত্যে একজন দিগ্‌গজ মনে করিতে লাগিলেন। শহরে আমার নাম হইতে লাগিল। অনেক ব্রাহ্মণ ইংরেজি শিখিবার

জন্য—তাঁহার বাটীতে রাত্রিবেলায় আসিয়া জুটিতেন। বেশ একটি জমাট বাঁধিল। ছোট ছোট ব্রাহ্মণের ছেলেদের জন্য—পাড়ায় একটা স্কুল খুলিলাম। ব্রাহ্মণের ছেলেদের নিকট বেতন লইতাম না। একটি সদাগরের ছেলেকে পড়াইয়া টাকা দশেক রোজগার করিতাম। তাহাতেই আমার এক রকম চলিয়া যাইত। তুই বেলাই ময়রার দোকানে গিয়া পুরী, দই, বরফি খাইতাম। লস্কর শহরে একজন বাঙালীবাবু ছিলেন। তিনি একজন ঠিকাদার। তাঁর তুপয়সা বেশ উপার্জন ছিল। পুরী খাইয়া খাইয়া জিব আড়ষ্ট হইয়া গেলে—তাঁর বাড়িতে এক এক দিন ভাত খাইয়া আসিতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু যাহার জন্য গিয়াছিলাম, তখন পর্যন্ত তাহার কিছুই করিতে পারি নাই।

দিন পনরো কাটিয়া গেলে—আমি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দেখা হইল। আমি বলিলাম—আমাকে সৈনিক করিয়া লউন। তিনি বলিলেন যে, তিনি নামে সেনাপতি বটে কিন্তু তাঁহার একটুও ক্ষমতা নাই। সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার অগাধ ভক্তি জন্মিল। কী সৌম্য মূর্তি! সৌম্যতা শিষ্টতার ভিতরে এক অপূর্ব অগ্নিময় তেজ সঞ্চারিত হইতেছিল। চোখ তুটি যেন বহ্নিজ্বালা। সেনাপতির সরল বিনীত কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম—মর্মাহত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সেনাপতির কোন ক্ষমতা নাই কেন। একবার গোয়ালিয়রে দৃশ্য-যুদ্ধ (mock fight) হয়। জয়াজী রাও মহারাজ—বর্তমান মহারাজের পিতা এক পক্ষে—আর সেনাপতি আর এক পক্ষে। ঐ দৃশ্য-যুদ্ধের উপলক্ষে মহা সমারোহ হয়। বড় বড় ফিরিঙ্গি সেনাপতি—ঐ যুদ্ধ দেখিতে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের রঙ্গ চলিতে থাকে—তুইজনেই বীর—রণ-কৌশলী। অবশেষে সেনাপতি—মহারাজকে বেষ্টন করিয়া ফেলেন। মহারাজ ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল। তখন মহারাজ হুকুম

করিলেন যে, তাঁর খানা আসিবার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া হউক। সেনাপতি বলিয়া পাঠাইলেন, খানা যাইতে দিব না—মহারাজ যদি পরাজয় স্বীকার করেন ত খানা পাইবেন। মহারাজকে অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সেই অবধি মহারাজের ক্রোধ সেনাপতির উপর পড়িল—তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল।

সেনাপতির বিষয়ে আর একটি কথা বলি। আমরা রাত্রিবেলায় ছাদে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় ভেরী বাজিয়া উঠিল। ভেরীর উপর ভেরী—কিছুই বুঝা গেল না। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক মশাল হাতে করিয়া আসিতে লাগিল। ব্যাপার কি? না, জয়াজী রাও মহারাজ স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে ছাউনি পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন। তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর। ছাউনিতে গিয়াই দেখেন যে, সেনাপতি তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত। মহারাজ ছাউনি পরিদর্শন করিলেন আর বলিলেন—আমার রাজ্যে একজন মানুষ আছে—ঐ আমার সেনাপতি। সেনাপতির ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যাঁহাকে সেনার ভার দেওয়া হইয়াছিল তাঁহার নাম—শামসের খাঁ। তিনি অল্পবয়স্ক—কিন্তু ঘোর বিলাসী। পরদিন ছাউনিতে ঢেঁট্‌রা দেওয়া হইল যে—সকলেই হাজির ছিল, কেবল শামসের খাঁ গরহাজির। সেনাপতির সম্মান করা হইল বটে কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না। রাজ-সরকারে তখন কুচক্রীদের প্রতাপ!!